সঙ্গোপনে

অন্নপূর্ণা গোস্বামী

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং
পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক
৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উৎসর্গ

যে কিশলয়গুলি মনের সঙ্গোপনে ছিল, তোমার প্রেরণাতেই তা ফুটে ওঠার গৌরব পেয়েছে—তাই বাণী মন্দিরের এই প্রথম অর্ঘ "তোমাকে" উৎসর্গ করলুম।

পৌষ, ১৩৪৮

সূচী

উপহার

পরিচায়িকা

ছোট বলিলেই সে ছোট হয় না। নামে 'ছোট গল্প', কিন্তু আসলে সেটি ছোট মোটেই নয়, বরং বিশেষ একটা বড় ব্যাপারই।

ছোট গল্প নামে অনেক কিছুই বাহির হয়, যাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয়, ছোট হয় গল্প হয় না, নয় গল্প হয়, ছোট হয় না। প্রকৃত ছোট গল্প বলিতে যাহা বুঝায়, বাংলা সাহিত্যে তাহা বিরল। গীদে মোপাঁসা, দোদো, টুর্গেজিভ বা টলষ্টয়ের ছোট গল্পের যে কাঠামো ও কৌশল, তাহা রবীন্দ্রনাথ ও প্রভাত কুমারের গল্প ছাড়া অন্য কোথাও বড় পাওয়া যায় না। সাধারণত, ছোট গল্পের নামে লেখক উপন্যাস ফাঁদেন, যেমন অনেক গৃহিণী ঘি-ভাতের নামে পোলাও রাঁধেন। ফতুয়া ও পাঞ্জাবী যেমন সমপরিমাণ কাপড়ে করা যায় না, ছোট গল্প ও উপন্যাসও তেমনি একই বিষয়-বস্তুতে গড়া যায় না। ছোট গল্প যেন আলু ভাজা, আর উপন্যাস জটিল শুকতানী। এ দুইয়ের আকার ও প্রকার উভয়ই সম্পূর্ণ বিভিন্ন। হীরার মাধুর্য যে মণিকায় তাহা মণিকার জানেন, কয়লার ঐশ্বর্য যে বৃহত্তায় সেটি খনিকার জানেন।

একটি বিশেষ ভাব বা ঘটনাকে রূপ দিতে যেমন ছন্দোবদ্ধ কবিতার জন্ম হয়, তেমনি গদ্যে সেটি ছোট গল্পে রূপায়িত হইয়া উঠে। অবশ্য তাই বলিয়া, কবিতার বিষয়-বস্তু মাত্রই ছোট গল্পের উপাদান নয় বা ছোট গল্পের কাঠামোও সর্বত্র কবিতার বাহন হয় না। পাকা রাঁধুণী জানে, আলুর দম ও আলুর চচ্চড়ি প্রস্তুত প্রণালী এক নয়; মাছের কালিয়া ও মাছের ঝোল, মাছের ব্যাপার হইলেও, কালিয়া ও ঝোলের মাছ সম্পূর্ণ পৃথক্ শ্রেণীর।

স্বামী-স্ত্রী এবং একটি বা দুইটি শিশুসন্তান লইয়া ক্ষুদ্র অথচ গরীব একটি সুখী পরিবারের মত ছোট গল্প। এ সংসারের গৃহিণীকে বিশেষ নিপুণা এবং হিসাবী হইতে হয়, কারণ মাপ করিয়া চাল-ডাল-তরকারি না লইলে, হয় কম পড়িবে, নয় অপচয় ঘটিবে—দুইই অবাঞ্ছনীয়। উপন্যাসের লেখক

বৃহত্তর পরিবার বা যজ্ঞবাড়ীর গৃহিণী : ইঁহার বহু লইয়া কারবার কাজেই চুল চিরিয়া বিচার এখানে চলে না। ভোজের বাড়ীর কাণ্ড, অনেক ভোজাই করিতে হয়, অনেক কিছুই ফেলাও যায়। সোরগোল হাঁকডাকেরও অন্ত নাই।

ছোট গল্পের লেখক পূর্বোল্লিখিত কেরাণীর সুগৃহিণীর ন্যায়। অনাবশ্যক বাহুল্য বা বিশেষ গোলমালের সুযোগ ও অবসর তাহার নাই। ইহার প্রত্যেকটি কথা হিসাব করা, প্রত্যেকটি ঘটনা বাহুল্যবর্জিত এবং অপরিহার্য এবং প্রত্যেকটি চরিত্র ফুলের পাঁপ্‌ড়ির মত ফুলটিকে সম্পূর্ণ করিয়া ধন্য।

কাজেই ছোট গল্পের ক্ষেত্র যেমন স্বল্প-পরিসর, তেমনি তাহার রচনা-কৌশলও অপেক্ষাকৃত শক্ত। বড় দেওয়াল-ঘড়ি অপেক্ষা ছোট হাত-ঘড়ি তৈরি যে কঠিনতর, তাহা বুঝিতে অসামান্য বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না, যদি মস্তিষ্কে উক্ত পদার্থের যৎসামান্যও থাকে।

কল্যাণীয়া শ্রীমতী অন্নপূর্ণা গোস্বামীর এই গ্রন্থান্তর্ভুক্ত গল্পগুলি আকারে যেমন ছোট, প্রকারেও তেমনি ঐশ্বর্যে পূর্ণ। হয়ত সর্বত্র সব জিনিষের যথাবিন্যাসে কিঞ্চিৎ ত্রুটি কোথাও কোথাও রহিয়া গিয়াছে—নবীন ব্রতীর পক্ষে সেগুলি অবশ্যম্ভাবী, এবং তেমন মারাত্মক নয় বলিয়া উপেক্ষণীয়। ছোট গল্প যে কি, এই পরম বস্তুটি যখন লেখিকা ধরিতে পারিয়া বলিবার ভঙ্গীটিও আয়ত্ত করিয়াছেন, তখন অনুশীলনের ফলে অচিরে তিনি যে একজন নিপুণ শিল্পীরূপে পরিগণিত হইবেন, ইহা আমি অকুণ্ঠিতচিত্তে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি। প্লটই ছোট গল্পের কাঠামো এবং ব্যঞ্জনাই তাহার প্রাণ। লেখিকা এই দুইটি দুর্লভ-রত্নের সন্ধান যখন পাইয়াছেন, তখন তাঁহার সাধনায় সরস্বতীর সরসমূর্তি প্রতিষ্ঠাও দুঃসাধ্য নয়। ইতি—

কলিকাতা,
সন ১৩৪৮ সাল, ১লা পৌষ। } **শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়**

ভূমিকা

আধুনিক বাঙ্গলা কথা সাহিত্যে শক্তিশালিনী লেখিকার সংখ্যা নগণ্য, এরূপ অভিযোগের হেতু যে নেই তা নয়। সামাজিক বাধ্যবাধকতার অতিশয়তার জন্য এদেশের মেয়েদের জীবনের পরিসর প্রসারিত নয়—এমন কথাও অনেকে ব'লে থাকেন। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা গেছে, লেখকই হোন আর লেখিকাই হোন, উপযুক্ত লালনের অভাবে কেবল যে শক্তির বিকাশই হয়নি তা নয়, প্রতিভার অপচয়ও ঘটেছে। এটি সাহিত্যের পক্ষে দুর্ভাগ্য।

জীবনের বিরাটত্ব ও বিশালতাকে ব্যক্তিগত ধারণার মধ্যে উপলব্ধি করার জন্য যে অবসর, সুযোগ ও আয়োজনের দরকার—বাঙ্গালী লেখিকাদের সামাজিক জীবনে ত'ার অভাব—এটি দুঃখের কথা। এর ফলে প্রণয়-কেন্দ্রিক গীতি কবিতা আর ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র গল্পের বেশী তাঁদের পক্ষে আর বিশেষ কিছু হয়ে ওঠেনি। এদেশের মেয়েদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ছাঁচ না বদলালে সাহিত্যলোকেও তাঁদের মুক্তি নেই। আর প্রচলিত বন্ধন-সংস্কার থেকে পরিপূর্ণ মুক্তি না ঘটলে তাঁরা যে সাহিত্য সৃষ্টির বিচিত্রতার ভিতরে এসে দাঁড়াতে পারবেন না, এত' বলাই বাহুল্য।

এরই মধ্যে যদি কোনো গৃহাঙ্গনার রচনায় ক্বচিৎ কিরণের দীপ্তি চোখে পড়ে, তবে বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নেই। শ্রীমতী অন্নপূর্ণার রচনায় প্রথম থেকেই আমি উৎসাহ বোধ করেছি। ধারাবাহিক অধ্যবসায়ের গুণে একদিন তাঁর রচনা সৌষ্ঠব-সম্পন্ন হয়ে উঠবে—একথা অকপটে স্বীকার করতে পেরেছি। সম্প্রতি তাঁর কয়েকটি ছোট গল্প 'সঙ্গোপনে' নাম দিয়ে পুস্তকাকারে

প্রকাশিত হচ্ছে। আমি বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলুম, নিতান্ত সাধারণ বাঙ্গালী ঘরের বিষয়বস্তুকে ছোট ছোট গল্পে সুচিত্রিত করার অনন্যসাধারণ দুঃসাহস তাঁর আছে। যারা আমাদের প্রত্যহ-জীবনে চোখে পড়ে, অথচ যাদের চেয়ে দেখিনে, তাদের প্রতি লেখিকার অকৃপণ স্নেহশীল দৃষ্টি জেগে রয়েছে। সাহিত্যিকের পক্ষে এটি দুর্লভ সম্পদ বৈকি। ছোট ছোট আনন্দ বেদনার, হাসি অশ্রুর সুন্দর ইতিহাস তাঁর গল্পে সুকথিত। তাঁর কল্পিত একটি বালিকার একটি অশ্রুবিন্দুতে মহাসিন্ধুর ছায়া প্রতিফলিত, তাঁর সামান্য একটি কাহিনীতে সমগ্র বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবন সুচিত্রিত। লেখিকার চিত্তলোকের সৌন্দর্য্য বৃত্তিতে গল্পগুলি ঐশ্বর্য্যময়।

অন্নপূর্ণার রচনায় আর একটি গুণ আমার চোখে পড়েছে, সেটি তাঁর সৃষ্ট কাহিনীর অনায়াস সরলতা ও মাধুর্য্য। সংশয় অথবা কঠিন জিজ্ঞাসার আলোড়নে তাঁর লেখা কোথাও ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেনি, জীবনের প্রতি কোনো রূঢ়তা অথবা আক্রোশ তাঁর গল্পে পরুষ-কাঠিন্য নিয়ে প্রকাশ পায়নি। গল্পের অঙ্গসজ্জায় ভঙ্গীমা অপেক্ষা প্রাণশক্তিকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন এটি সত্যই আনন্দের কথা। গ্রামের নদীটি এঁকে বেঁকে চলেছে কবিতার সুরধারার মতো—তাকে কুটিলগতি না ব'লে অনাড়ম্বর সরলতাই বলবো। একজন নূতন লেখিকার রচনায় এই আশ্বাস পাওয়া সামান্য কথা নয়।

কথাসাহিত্য রচনায় তাঁর উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটবে, একথা আমি জানি—সেই কারণেই তাঁর পরবর্ত্তী গ্রন্থের জন্য আমি উদগ্রীব হয়ে থাকবো। তাঁর লেখনী সার্থক হবার পথ চিনে চলেছে, এই আমি বিশ্বাস করি।

প্রবোধকুমার সান্যাল

প্রীতি-অর্ঘ্য

আজি স্নিগ্ধ শারদ প্রাতে
নিকুঞ্জে তব ফুটেছে যে ফুল
একটী নয়নাঘাতে।
একটী কুসুম একটুকু মধু,
একটু পরাগ সৌরভ মৃদু
সঞ্চিত আছে তারি তরে শুধু,
মর্ম্ম অর্ঘপাতে।
ছন্দ গীতির অঞ্জলী ভরি
দিও তার রাঙ্গা হাতে।
আজি শান্ত শারদ বায়।
অঞ্চল ভরি গেথেছ যে মালা
চঞ্চল বনছায়।
একটী নম্র নতি, একটু মুগ্ধ প্রীতি,
নিত্য জাগিছে চিত্ত গহনে
অশ্রুত যত গীতি।
আজি বঞ্জুল প্রাতে, মঞ্জুল হাতে
দিও তার রাঙ্গা পায়।
স্বপ্ন সাধনা বিকশি উঠুক
শারদ পূর্ণিমায়॥

ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

"সঙ্গোপনে"

কুড়িগ্রাম হাইস্কুলের হেডমাষ্টার মৃণালবাবু তাঁর একটিমাত্র মেয়ে রেণুকে মেন ট্রেণে তুলে দিতে তিস্তা জংসন পর্যন্ত এসেছেন। গত কয়েক মাস আগে কোলকাতায় রেণুর বিয়ে হয়েছে, এই প্রথম সে ঘর করতে শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছে, ওর স্বামী সুব্রত ওকে নিতে এসেছে।

তখনও গাড়ী আসতে কতকটা দেরী, টিনে ঢাকা ছোট প্লাটফর্মের এক পাশের একখানি বেঞ্চে রেণু বাপের পাশে বসে আছে। আসন্ন বিদায়-লগ্নের একটা মুমূর্ষু বেদনা উভয়ের ম্লান দৃষ্টির রেখায় ধূসর হয়ে উঠেছে। বাপ কত কথা, কত উপদেশ, আদেশ মেয়েকে শোনাতে অধীর হয়ে উঠেছেন, কিন্তু অবরুদ্ধ কণ্ঠস্বরে তাঁর একটিও কথা ফুটতে পারছে না।

একটিমাত্র মেয়ে প্রাণের পুতুলী, নয়নের মণি রেণুকে বিদায় দিয়ে, কেমন করে তিনি সময় কাটাবেন, এই ভাবনাই তাঁকে বড়ই চঞ্চল করে তুলেছিল, কিন্তু এই বিধানই যুগে যুগে, কালে কালে চলে আসছে; এর কোনও পরিবর্তনই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

তবু তিনি মরিয়া হয়ে রেণুর শ্বশুরকে লিখেছিলেন, "অন্ততঃপক্ষে দুর্গোৎসবের কয়েকটা দিন পরে য'দি তাঁদের বউকে নিয়ে যান্—, তা'হলে বড় ভালো হয়।"

এর উত্তরে রেণুর শ্বশুর লিখেছিলেন, "তাই কী সম্ভব হয় ভাই, তবে কলেজেপড়া ছেলের বিয়ে দিলুম কেন? পূজোর সময় বউ না হলে কী ঘর মানায় কখনও?"

এর পর কন্যাপক্ষের আর কথা চলে না, সংসারের চিরন্তন রীতি অনুযায়ী বরপক্ষের সুনিশ্চিত জয়ই সুস্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ হয়ে উঠলো।

মৃণালবাবু শুধু চিঠিখানা হাতে নিয়ে স্ত্রী রমারাণীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন "মেয়ে,—বউ,—অর্থাৎ কন্যা, বধূ সংসারে কার প্রয়োজন বেশী বলতে পারো রমা? রেণুর ওপরে আমার পিতৃত্বের দাবী অখণ্ডনীয়, তার চেয়ে কী পুত্রবধূর দাবীটাই ওর শ্বশুরের বড় হবে নাকি?"

রমারাণী একথার প্রথমে কিছু উত্তর দেননি, শেষকালে স্বামীর উত্তর-প্রতিক্ষিত মুখের দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে যেতে বলেছিলেন, "নারায়ণ, অগ্নি, ব্রাহ্মণ সাক্ষী করে যেদিন মেয়েকে ভিন্ন গোত্রে সম্প্রদান করে দিয়েছে, তারপর থেকে তার ওপরের দাবী, অধিকার, স্বত্ত্বা, স্নেহ, মমতা সব কিছু বিসর্জন দিতেই চেষ্টা করো।"

স্ত্রীর এই কথাগুলোই সেদিন মৃণালবাবুর পরম সান্ত্বনার বিষয় হয়েছিল।

খানিকটে দূরে কালো রঙের কাঁকড় বেছানো পথে জুতোর কর্‌কর্‌ মর্‌মর্‌ শব্দ করে সুব্রত ঘুরে বেরাচ্ছে, ওর সুন্দর সুকুমার কান্ত আনন-শ্রীতে তরুণ প্রাণের নূতন কল্লোলের তট ভেঙ্গে যেন একটা তীব্র অথচ মদির সুখের স্বপ্ন মধুর জোয়ার উপচে উপচে পড়ছে। চলার ভঙ্গিমা দীপ্তিমান, ও যেন বিরাট এক অভিযানে জয়লাভ করেছে।

মাঝে মাঝে চশমার ফাঁক দিয়ে বাঁকা চোখে বধূর সুগৌর মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌ছে—, রেণুর সে মুখ অশ্রু-সজল, চোখ থেকে

ক্রমান্বয়ে জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে ওর মুখের পাউডার ধুয়ে যাচ্ছে, চূর্ণিত চুলগুলি ললিত ললাটে ছড়িয়ে পড়েছে, কখন যেন ওর অসতর্ক মুহূর্তে হাতের ঘষায় ছোট্ট সিঁদুরের ফোটাটি সারা মুখে মেখে একাকার হয়ে গিয়েছে।

ওকে সান্ত্বনা দিতে সুব্রতর মমতা-আদ্র মনটা ব্যাকুলিত হয়ে উঠেছিল। কিছুক্ষণ পরে ঝাঁ ঝা করতে করতে মেল লাইনের গাড়ী এসে প্লাটফর্মে অন্ধকারের ছায়া ফেলে দাঁড়ালো। ভীড়ের সমারোহে সমস্ত কামরাগুলি অপর্যাপ্ত যাত্রীতে পরিপূর্ণ। তিল ধারণেরও স্থান নেই—যেন আগত মহামায়ার অর্চনাকে উপলক্ষ করে মানুষ যে একটানা জীবনে একটু আনন্দ, একটু বৈচিত্র চাইছে, এই কলরবপূর্ণ, যাত্রীঠাসা বিরাটকায় গাড়ীখানা এই কথাই সুস্পষ্ট প্রমাণ করছে।

সুব্রত পূর্ণ উদ্যমে একখানি থার্ড ক্লাস কামরায় লগেজ পত্র তুলিয়ে, সসম্ভ্রমে শ্বশুরকে প্রণাম করে বধূর দিকে তাকালো। রেণু হেঁট হয়ে বাপের পদধূলি নিচ্ছিল, তাকে হাতধরে তুলে গাড়ীতে উঠিয়ে দিতে দিতে মৃণালবাবু সুব্রতকে বল্লেন—"এ গাড়ীতে যে ভীড়, মেয়ে গাড়ীতেই তো রেণুকে দিলে পারতে সুব্রত—"

"দেখছেন না—, যে কাঁদছে, রাত্তিরে হয়তো কিছু খাবে না—" সুব্রত মুখটা রুমালে ঘসে মুছে ফেল্লো।

এইখানেই বুঝি বাপের কন্যা সম্প্রদানের পরিপূর্ণতা এবং সার্থকতা—; রেণুর প্রতি সুব্রতর প্রীতি প্রগাঢ় অন্তরের এই সহানুভূতির আর্দ্রতার পরিচয় পেয়ে, আসন্ন-কন্যা বিচ্ছেদের এই অশ্রুসজল মুহূর্তেও মৃণালবাবুর মনের নিভৃততম প্রান্তে বেশ একটা নিবিড় আনন্দ অনুভব করলেন।

কিন্তু পরমুহূর্তেই একটি বেদনা কঠিন ঢেউর আবর্তে তাঁর প্রাণের তটের পুলক-প্রবাহ সাগরের কোন্ অতল্ গর্ভে তলিয়ে গেল, মর্মবীণায় রুক্ষস্বরে এই কথাই ঝঙ্কার তুললো—, "আশৈশব যাকে তিনি হাতে গড়ে এত বড়টি করে তুল্‌লেন,—তা' কী শুধুই অন্যকে এসে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার জন্যই ? কেন রেণুর জীবন এতদিন এই অযাচিত প্রীতির অভাবে ব্যর্থ হয়েছিল নাকি ? তাঁদের সংসারকাননকে একমাত্র সেই তো চির ফাল্গুনের পুষ্পিত সমারোহে প্রাণ-প্রাচুর্যে মুখরিত করে রেখেছিল—"

কুলীদের হট্টগোলে, ফেরিওয়ালাদের চীৎকারে মৃণালবাবুর চিন্তা-তন্ত্রী কেটে গেল, তখন গাড়ী ছাড়বার ঘণ্টা পড়ে গিয়েছে, গার্ডের সবুজ নিশানের ইঙ্গিতে ইঞ্জিনে বাঁশী বেজে উঠতে, যাত্রীদের বিভিন্ন অন্তর অনুভূতিতে হর্ষ, বেদনা, বিরহ, অশ্রু প্রভৃতিগুলি বিভিন্নরূপে বিভিন্ন হৃদয় কম্পনে দোল দিয়ে কামরাগুলি নড়ে চড়ে হেলে দুলে উঠলো।

দরজাটার সঙ্গে যেন আঠা দিয়ে লেপ্‌টে বাইরে মুখ বের করে দিয়ে রেণু দাঁড়িয়েছিল, যতক্ষণ দেখা গেল ও বাপের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো, চোখে ওর আগে ছিল আষাঢ়ের" বাদল, এখন তা' শ্রাবণের অজস্র ধারায় রূপান্তরিত হয়েছে, ব্লাউজের নীচের বডিসটাও ভিজে সপ্‌সপ করছে। .

ওকে সান্ত্বনা দিতে মৃণালবাবুর অধররেখায় মৃদু মৃদু হাসি স্তিমিত হয়ে রয়েছে, সর্বহারার চিত্রখানি তাঁর চোখের অনুজ্জ্বল দৃষ্টিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তখন সুন্দর শরৎকালের শান্ত অপরাহ্ণ বেলার মুমূর্ষু আলো পশ্চিম আকাশকে সান্ধ্যরাগে আরক্তিম করে তুলেছে, পূর্ব দিগন্তে তার বিদায়মুখী আতপ্তরশ্মি তখনও সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায়নি, গাছের শাখে,

পল্লবে, প্রান্তরে, মাঠে, ঘাটে, বনে, উপবনে স্তিমিত উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। প্লাটফর্ম অতিক্রান্তে পূর্ণ উদ্যমে গাড়ী ছুটতে সুরু করে দিয়েছে। শারদশ্রীর রমণীয় বিকাশে ধরণী-প্রাঙ্গণ স্নিগ্ধ মদির হয়ে উঠেছে। বাতাসে মৃদু আন্দোলিত পাকা ধানের শীষগুলি স্বর্ণ রঙ্গে ঝলমল করছে। এক ঝলক শেফালী ফুলের মধুর গন্ধ রেণুদের কামরায় ভেসে এল।

রেণু গলাটা বাহিরে বেশী করে বের করে দিয়ে আরও খানিকটে ঝুঁকলো, কিন্তু এবার আর সে তার বাপকে দেখতে পেলো না।

পিছনে দাঁড়িয়েছিল সুব্রত, বললো, "অত ঝুঁকো না, পড়ে যাবে যে" —সে একখানা হাত রেণুর কাঁধের উপর রাখলো।

রেণু পিছন ফিরে ওর দিকে তাকিয়েই ফিক করে হেসে ফেললো, গালে যে দু'ফোটা জল চক্‌চক্ করছিল, রুমালে তা' মুছলো। সুব্রত ওর দিকে তাকিয়ে মধুর করে হাসলো।

গাড়ীর আসন কয়টি ভর্তি ছিল, সুব্রত হয়তো বা চেষ্টা করলে ওরই মধ্যে একটু ওদের দু'জনের স্থান করে নিতে পারতো,—কিন্তু সে ব্যবস্থা তার রুচিসঙ্গত হোল না, দরজা আর বাথরুম বাঁচিয়ে তার মাঝামাঝি জায়গায় নিজের তোড়ঙ্গের উপরে একখানি সুজনী দু'ভাঁজ করে পেতে বস্‌বার মত জায়গা করে নিল। ভীড়ের মধ্যে এইটুকুই হবে ওদের শান্ত নিরিবিলি, ওদের স্বাতন্ত্র্যকে সম্মানিত করবে, জনতার কলরব ওদের স্পর্শ করতে পারবে না। স্বামীর একান্ত পাশটিতে বসে দীর্ঘ পল্লবে ঢাকা চোখ দু'টি মেলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে রেণু বল্‌লো, "আমাকে তো মেয়ে গাড়ীতেই দিলে পারতে, দেখছো না অসভ্য লোকগুলো কী বর্বরের মত তাকিয়ে রয়েছে।"

"দেবী প্রতিমার দিকেও তো ভক্ত একাগ্রনয়নে তাকিয়ে থাকে, মনে কর ওদেরও ওই দৃষ্টির তলে ভক্তিরই পুষ্পাঞ্জলি ঝরে ঝরে পড়ছে," মিষ্টি হেসে সুব্রত বল্‌লো, "আর ভালো লাগে না রেণু, তোমায় দূরে দূরে রাখতে, কতদিন হয়ে গেল বলত ? সেই শ্রাবণে বিয়ে হয়েছে—"

"মোটে তো দু'মাস" চোখের কোণে একটা মিষ্ট কটাক্ষ রেখে রেণু বল্‌লো—, "কিন্তু তোমার সঙ্গে এই একটানা গাড়ী চড়ে কত মাঠ, ঘাট, বন, উপবন, নদ, নদী পার হয়ে যেতে আমার বেশ লাগছে, এ যাত্রা যদি অনন্তকালের জন্য হোত, ভাব তো একবার কী চমৎকারই না হোত, সত্যি কী মধুর যেন আমেজ মাখানো, মাদকতা ভরা—"

স্ত্রীর চেয়েও উচ্ছ্বসিত হয়ে সুব্রত বল্‌লো—"এর চেয়েও সুন্দর, কিন্তু মাধবী রাতের নিভৃত যামিনী, জানো রেণু বড়দিনের বন্ধে আমরা সেকেণ্ড ক্লাশ কামরা রিজার্ভ করে পশ্চিম বেড়িয়ে আসবো।"

চঞ্চলকণ্ঠে হাস্‌তে হাস্‌তে রেণু বল্‌লো—, "তা'হলে কিন্তু সেইদিনই তুমি ভেড়া বনে যাবে, আগে থেকে বলে রাখছি।"

"তাতে আমার আপত্তি নেই—" সুব্রত বল্‌লো, "তুমি যদি আমার একটা নামকরণ কর সব্যসাচী, আর পার্থ ব'লে একবার সম্বোধন কর, কেন না অর্জ্জুনেরও স্ত্রীর আঁচল কম মিষ্টি ছিল না—আগেকার যুগটাই আসল চমৎকার ছিল, আমাদের এখন খোলাখুলিভাবে মাত্র একটি স্ত্রী নিয়ে ঘর করতে হয়, আর তাঁদের সময়—"

"ওঃ মার্ভেলাস"—রেণু গম্ভীরভাবে জবাব দিলো—"দ্রৌপদীর পঞ্চ পাণ্ডবের কথা ভাবতে আমার ভারী ভালো লাগে, আর এখন এক পাণ্ডব নিয়ে নীড় বাঁধাও যেন মহাপাপের তুল্য!" এবার রেণুর কণ্ঠস্বরে খেদ

মিশ্রিত একটা আন্তরিকতার সুর বাজলো ও বল্লো.—"ভাগ্যে শ্বশুরের ব্লাডপেশারটা বেড়েছিল, তাই বেড়ালের ভাগ্যে একবার শিকে ছিঁড়েছে—, তোমার সঙ্গে ট্রেণে চড়ার এই তৃপ্তি অনুভব করতে পারছি—, তারপর তো সেই বন্দীজীবন মনে করতেই হাঁফ ধরে আসে যেন। আমাদের সমাজের বিয়েটা ঠিক যেন আষ্টে পৃষ্ঠে রজ্জুতে বেঁধে দেওয়া—শাশুড়ী, ননদের রিষ্টি কাটাতে না কাটাতে ষষ্ঠীদেবীর অনন্তবর্ষী কৃপায় একেবারে অতীষ্ঠ হয়ে উঠতে হয় যেন—"

এর উত্তরে সুব্রত আস্তে আস্তে যেন কী বল্লো,—গাড়ীর শব্দে তা' শোনা গেল না,—রেণু বলে উঠলো, হ্যাঁ তাই যদি হবে, তবে লীলাদি তো বি-এ পাশ করেছে, ওর অজানা কিছুই নেই, তিন বছরে কেন তিনটে ছেলে হোল? শেষবারটা আবার যমজ,—ওঃ কী কষ্ট ওদের স্বামী স্ত্রীর—সারা রাত প্রায় ছেলে ছ'টোকে নিয়ে জেগে বসে থাকতে হয়—"

রেণুর কথা সম্পূর্ণ হবার আগেই গাড়ী এসে রংপুর ষ্টেশনে থাম্লো। গাড়ীর ভীড় বাড়বার আশঙ্কায় গাড়ীশুদ্ধ যাত্রী চঞ্চল ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো, কোলাহলভরা প্লাটফর্মের দিকে ব্যগ্র চোখে সুব্রত তাকিয়ে রইলো। সর্বপ্রথম কয়েকটি কলেজের ছাত্র গাড়ীতে উঠে বস্‌বার জায়গা না পেয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলো, সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ওদের পায়ের উপর বড় বড় বাক্স বিছানা হুড়্মুড় করে পড়তে সুরু করলো। ত্রস্ত পায়ে ছ'টি মাড়োয়ারী ভদ্রলোক গাড়ীতে উঠে জিনিষপত্রগুলি গোছগাছ করে যুবক কয়জনকে উদ্দেশ্য করে বল্লেন, "আপনারা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? ওধারের ওই বেঞ্চে যেয়ে বসুন না—"

সঙ্গোপনে

ওধারের আসনে একটি পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের মহিলা, পা দু'টি বেঞ্চের উপরেই ছড়িয়ে দিয়েই বসেছিলেন—, পায়ে তাঁর কী হয়েছিল জানি না, বাকী জায়গাটুকুতে একখানি কাঁথা পেতে ঘুমন্ত শিশু পুত্রটিকে শুইয়ে রেখেছিলেন। ওই দিকে নম্র চোখে তাকিয়ে একটি ছাত্র বল্‌লো—, "দেখ্‌ছেন না মশাই, ও সীটে লেডি রয়েছেন যে—"

"ওসব লেডি ফেডি আমরা জানি না—, এটা ল্যাড়া গাড়ী" বল্‌তে বল্‌তে মাড়োয়ারীদ্বয় তাদের বিরাটকায় বপু্ দিয়ে ভীড় ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে ওদিককার আসনে প্রায় কচি শিশুটির নরম তুল্‌তুলে পায়ের উপরই বসে পড়ছিল। শিশুটির জননী তাড়াতাড়ি কম্পিত হাতে তাকে কোলে তুলে নিলেন। শিশুটির বাপ ওই আসনের সুমুখের বেঞ্চে বসেছিলেন, পরপুরুষের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর পাশাপাশি সমাসীনের ব্যবধান রাখ্‌তে মাড়োয়ারীর পাশে বসলেন এসে। যুবক কয়টিও উপবেশনের একটু স্থান পেলো। ওরা তখন চুপি চুপি বল্‌ছে—"পুরুষের গাড়ীতে চড়তে হলে মেয়েদের একটু স্মার্ট হওয়া চাই—আমরা না হয় সমীহ করে চল্‌লুম—, সবাই তা' শুন্‌বে কেন?"

এদিককার দরজার পাশের বেঞ্চিটা ঘেঁষে, নতমুখে একটি অল্পবয়স্কা বধূ দাঁড়িয়ে—, সে এইমাত্র গাড়ীতে উঠেছে, স্বামী তার খাবার কিনতে গেছেন। 'বধূটির চোখ মুখ দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে ঢাকা, সম্ভবতঃ সে নিজেও জানে না কোথায় সে যে দাঁড়িয়ে আছে, উপরন্তু অন্যের কৌতূহল বাড়াচ্ছে —ওই ঘোমটার আড়ালে না জানি কি গোপনীয় বস্তু লুকানো আছে।

হঠাৎ এক ভদ্রলোক বল্‌লেন—"ও মা দেখুন, আপনার কাপড় ওই ছোকরা বিড়িতে পুড়িয়ে দিয়েছে—"

বধূটি প্রায় একটি পাঞ্জাবী ছোকরার গায়ের উপরই দাঁড়িয়েছিল, ত্রস্তে সরে এসে ঘোমটা একটু উঠিয়ে, শাড়ীর আঁচলটা পুড়ছিল তখনও, হাত দিয়ে ঘসে নিবিয়ে ফেল্‌লো।

পাঞ্জাবী ছেলেটি এ কাজ ইচ্ছে করে করেনি সম্ভবতঃ বধূটির সুরভিত চুলের মদির গন্ধে সে আত্মসমাহিত হয়েছিল। আধপোড়া বিড়িটায় আরও কয়েকটা টান দেবার ওর ইচ্ছে থাক্‌লেও ও লোভাতুর মনটাকে সংযত করে, তাড়াতাড়ি সে'টা ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিল।

রেণু বধূটিকে লক্ষ্য করে নিম্নস্বরে সুব্রতকে বল্‌লো—, "বাবা—, নাচতে নেমে কেন যে ঘোমটা টানে, তার ঠিক নেই—, বেনারসী শাড়ীটা কতটা পুড়ে গেল।"

গাড়ী ছাড়বার ঘণ্টা পড়তেই, বধূটির স্বামী টিফিন কেরিয়র করে খাবার কিনে ছুটতে ছুটতে গাড়ীতে উঠে ঠোঁঠ দু'টি বিকৃত করে কামরার ভীড়ের দিকে তাকিয়ে ক্লান্তকণ্ঠে বল্‌লেন, "বাব্বা, মেয়েছেলেও কা দাঁড়িয়ে যাবে নাকি? নাঃ মেয়ে গাড়ীতেই দিলে হোত—তা' যে য়াক্সিডেন্টের ধূম পড়ে গেছে, মরি তো সব এক সঙ্গেই মরবো—"

রেণু অনেক কষ্টেও ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে হাসি সম্বরণ করতে পারলো না। হাসির উৎসে রুমালের অন্তরালে ওর ঠোঁট দু'টি উচ্ছ্বসিত হয়েছিল তখন।

সুব্রত আস্তে আস্তে বল্‌লো, "দ্বিতীয় পক্ষ বোধ হয়, তাই দরদের বুঝি অন্ত নেই, শিকেতেই তোলা যেন—"

রেণু বল্‌লো, "তৃতীয়ও হতে পারে, ভদ্রলোকের বয়স তো পঞ্চাশের কোঠাও অতিক্রম করেছে।"

তখন পাঞ্জাবী ছেলেটি নিজের পাশে ওই দম্পতীকে একটু বসার স্থান করে দিয়েছে। গাড়ী চলার সঙ্গে সঙ্গে কামরায় হাওয়া বইতে সুরু করলো, জনতার চাঞ্চল্য শান্তভাব ধারণ করলো। নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী কেউ গান, কেউ বা গল্প গুজবে মন দিল, কেউ বা উদাস প্রান্তরের দিকে আনমনা চোখে তাকিয়ে রইলো, তারই মধ্যে কয়েকজন কোলের উপর তাস রেখে খেলা সুরু করে দিল। শেষোক্তদের অনুকরণ যদি সংসারে সব লোক করতে পারতো, পৃথিবী থেকে নিশ্চয় দুঃখ বেদনা একদিন অবলুপ্ত হয়ে যেতো। ঈশ্বরের সত্য করুণা ওদেরই উপর অনন্তবর্ষী।

যথা সময়ে কয়েক ঘণ্টা পর পার্বতীপুর জংসন ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছুলো, এইখানে গাড়ী বদল করতে হ'বে, নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসের থার্ড এবং ইণ্টারের দৃশ্য দেখে সুব্রতর কাণ দু'টি গরম হয়ে মাথার মধ্যে বন্‌বন্ করে ঘুরতে সুরু করে দিল। ওর মনে হোল যাত্রী বোঝাই যেন একখানি মালগাড়ী এসে ওর সামনে দাঁড়াল, নিজের মনেই বল্‌লো—, "আচ্ছা এত লোক কেন একসঙ্গে গাড়ী চড়ে— ?" ও তারপর প্রায় ছুটতে ছুটতে টিকিট ঘরে যেয়ে, ওদের টিকিট বদ্‌লে সেকেণ্ড ক্লাশ করে এনে রেণুকে বল্‌লো—, "বাবা সম্ভবতঃ শেয়ালদহ আসবেন, তাঁকে বল্‌লে হবে গাড়ীর ভীড় দেখে তোমার বাবাই এ ব্যবস্থা করেছেন, কলেজে পড়া ছেলের এত বাবুগিরি তিনি কিছুতেই সহ্য করবেন না।" "বিয়ে দিয়েছেন এই ভাগ্যি—" বলে রেণু গাড়ীতে উঠে জনশূন্য কামরাটার সব আলোগুলো নিভিয়ে দিয়ে আরও স্নিগ্ধ, আরও নিরবচ্ছিন্ন নিরিবিলি তাকে করে তুলে জানালায় এসে দাঁড়ালো, জিনিষপত্র গোছগাছ করে ওর পাশে এসে দাঁড়িয়ে সুব্রত বল্‌লো—, "এই বেশ হোল না রেণু? বাকী যাত্রাটুকু

মধুর হয়ে উঠতে পারবে,—গাড়ীটা ছাড়লেই দরজা লক্ করে দেব—” ঠিক সেই সময় একটা কুলী গাড়ীতে উঠে আলো জ্বেলে দিয়ে কয়েকটি বাক্স বিছানা তুল্‌লো—, সঙ্গে সঙ্গে সাহেবী পোষাক পরা এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক গাড়ীতে উঠে কুলীকে পয়সা মিটিয়ে দিলেন।

সুব্রত পিছন ফিরে ভদ্রলোকটির দিকে তাকিয়ে বল্‌লো—“এই যে নীহারদা, কোথায় চল্‌লে?”

নীহারদা তখন হোল্ডঅল খুলে বার্থে বিছানা পেতে জায়গাটা অধিকার করে নিতে ব্যস্ত, কোনও দিকে তাকানোর অবসর পান্‌নি—, পরিচিত গলার স্বর শুনে সুব্রতর দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন,—“আরে সুব্রত যে, তারপর কোথায় চল্‌লে, সঙ্গে বউমা নাকি, তা’হলে তো তোমাদের ভারী অসুবিধা করলুম আমি—।”

এই নীহারদার সঙ্গে একদিন সুব্রতর প্রতিবেশী হিসেবে গভীর অন্তরঙ্গতা ছিল, এখন নীহারদা একজন সরকারের উঁচুদরের কর্মচারী—চাকরী ছাড়া সংসারে যে আর কিছু থাকতে পারে সে সম্বন্ধে তিনি একেবারে বেমালুম নির্লিপ্ত।

নীহারদার পাশে এসে বসে শুষ্ক গলায় সুব্রত বল্‌লো—, “না, অসুবিধে কী বল দাদা—, ওঃ কতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হোল, ভারী আনন্দ হচ্ছে কিন্তু; আমি এই ওঁকে নিতে এসেছিলুম, কোলকাতা ফিরছি—, তুমি?”

—“আমি আবার যাবো কোন্ চুলোয়—” হা—হা করে হাস্‌তে হাসতে নীহারদা বল্‌লেন—, “কাল কাজে জয়েন করার ডেট—, আছি এখন রাণাঘাটে জানোতো? ক’দিনের ছুটীতে দাদার মেয়ের খুব অসুখ শুনে বাড়ী গেছলুম—, এই তো ফিরছি—,

"তা বউদি কই ? একা যে ?"—সুব্রত জিজ্ঞেস করলো।

—"ওদের ইন্টার লেডিজে তুলে দিয়েছি—" সুব্রতকে মাথার দিকে রেখে লম্বা হয়ে আলস্যভরে শুয়ে পড়ে নীহারদা বললেন—, "এ গাড়ীতে ওদের আনলে তুমি জানো না সুব্রত রাত্রিটা হবে একেবারে স্লিপলেশ—, সে চ্যাঁ ভ্যাঁ এর দুধের বোতল ধুয়ে দাও—, ওর কাঁথা বদলে দাও, আর পারা যায় না ভাই, ঝি চাকরগুলোও ষষ্ঠীর দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হয়ে পালিয়ে যায়—"

—"তা বউদিই একা সব ভার বইবেন নাকি, তোমারও তো কিছু দায়িত্ব আছে।" রেণু তখন ওদিক্‌কার বার্থে শুয়ে পড়েছিল, নীহারদার কথাগুলো ওর বুকের ভিতরটা কাঁপিয়ে দিল যেন—, "এই কী তবে সুন্দর জীবনের পরিণতি নাকি ? ওগো—না-না-না পূর্ণ সম্ভারে ফুটে ওঠা ফুলকে তোমরা অনাদৃত করে ফেলে দিও না, তার চেয়ে বরং মুকুলকেই ঝরিয়ে দিও তোমরা ধূলোর এই ধরণীতে, একটা নিশ্বাস ফেলে রেণু ওপাশ ফিরে শুলো। ওদিকে দুই বন্ধুর তখন ক্লান্তকণ্ঠে গল্প চলছে, এক সময় নীহারদা ঘুমিয়ে পড়লেন। আর তা' ছাড়া না ঘুমিয়েও তাঁর উপায় ছিল না—, কেন না, সুব্রতর নূতন বধূ শিক্ষিতা এবং মডার্ণ মেয়ে রেণুর সঙ্গে আলাপ করা অন্ততঃপক্ষে আধুনিক যুগের রীতি অনুযায়ী তাঁর পক্ষে খুবই ন্যায়সঙ্গত ছিল—কিন্তু সে সম্বন্ধে তাঁর বিরুদ্ধ মত সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। তবে এর কারণ নারীর প্রতি অপর্যাপ্ত সম্ভ্রম অথবা সম্মান প্রদর্শন নয়, একটা রক্ষণশীল মনোবৃত্তি।

রেণুও তখন গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিল, ওর মাথায় উপাধান ছিল না, মাথা থেকে কাপড়টা পড়ে গেছলো। সুব্রত আনমনাভাবে ওর

খোপায় গোঁজা কয়েকটি গোলাপ ফুলের দিকে তাকিয়েছিল। লাইন ও গাড়ীর চাকার বিরাট সংঘর্ষের শব্দেও কামরার মধ্যে একটা নিরবচ্ছিন্ন স্তব্ধতা যেন অত্যন্ত সঙ্গোপনে স্বতন্ত্র হয়ে বিরাজ করছিল।

হঠাৎ এক সময় রেণু ঘুমের মধ্যে চম্‌কে উঠে চীৎকার করে উঠলো—"ওমা—, মাগো দেখ না খোকা আমার খোঁপার ফুল সব ছিঁড়ে দিচ্ছে, —ওরে বাবা কী দস্যি ছেলে, সারা সকাল ধরে বোনাটা শেষ করলুম—, সব ফর্‌ফর্‌ করে টেনে খুলে দিল; বাবা তুমি ভেবো না—, তুমি কেঁদো না, আমি লক্ষ্মীপূজোর পর দিন ঠিক চলে আসবো—"

সুব্রত তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে, ওর শিয়রে বসে অত্যন্ত সন্তর্পণের সঙ্গে ওর মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিয়ে চিবুকে ঈষৎ নাড়া দিয়ে বল্‌লে—"রেণু, ও রেণু কী হোল, এই যে আমার সঙ্গে যাচ্ছ তুমি—"

রেণু একবার নড়ে উঠে তন্দ্রালস চোখ দুটি মেলে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লো—"কই কিছুতো আমার হয়নি—" আবার সে চোখ দুটি মুদ্রিত করলো, মুহূর্তে সে সুপ্তির কোলে তলিয়ে গেল।

সুব্রত ওর কোঁকড়ানো চুলগুলির ভিতর অঙ্গুলি সঞ্চালন করতে করতে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো, এক টুকরো ম্লান হাসি সে রেণুর অধরের রেখায় সুস্পষ্ট অনুভব করলো, একটি ছোট্ট দীর্ঘ নিশ্বাস ওর বুকের তলে প্রগাঢ় হয়ে উঠলো।

* * * *

ঠিক সেই সময় মৃণালবাবু তাঁর কুড়িগ্রাম আবাসে রাত্রের আহারে বসেছিলেন, থালায় সবই তাঁর থরে থরে সাজানো রয়েছে, কিছু ভাজা

চিবুতে চিবুতে এক সময় তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"ওরা বোধ হয় এতক্ষণ সান্তাহার পৌঁচেছে নয় রমা?"—একথা তুমি আর কতবার জিজ্ঞাসা করবে বল তো? না যদি খাও কিছু উঠে পড়—খাবারগুলো কুকুরটার মুখে ধরে দিয়ে আসি—।" একটু থেমে মৃদু তিরস্কারের কণ্ঠে রমারাণী বল্‌লেন—"মেয়ে তোমার একাই হয়েছে—তুমিই একা মেয়ের বিয়ে দিয়েছ নয়—?"

না না তা নয়, বল্‌ছিলুম রেণুর তবে ওখানে কষ্ট বোধ হয় হবে না—"আঃ পোকাগুলো বড় জ্বালাতন করে"—মৃণালবাবু বা হাত দিয়ে কোঁচার খুঁটে চোখ মুছে ফেললেন।

কিন্তু রমারাণী দেখলেন—, ওখানে একটিমাত্রও পোকার চিহ্নটুকু ছিল না। তিনি দ্রুতপায়ে ঘরের বাইরে চলে গেলেন।

"শোধ-বোধ"

"তাইইতো সত্যি বেলা যে পড়ে এল কাঞ্চি—"

"মায়জী।"

"গাড়ী সাবকো পাশ লে গিয়্যা হ্যায়—?"

"জী—হুজুর!"

'দেখ বলে দে রান্নাঘরে, এখন যেন কাটলেটগুলো না ভাজে, কয়লা দিয়ে রাখতে বলিস্ উনুনে—' একটা স্তিমিত চিন্তার আলোড়নে উশ্রীর ভাষাগুলো হিন্দী বাঙ্গলার সংমিশ্রণে বিপর্যস্ত হয়ে উঠলো, ও যেন একটা আমেজ মধুর মদির স্বপ্ন থেকে জাগ্রত হোল, পড়ছিল প্রবোধ সান্যালের "অরণ্য পথ" খানা, নেশা-আবিলচিত্তে সেখানা কোলের উপর রেখে আবছা হয়ে আসা দিগন্তের ম্লান রদ্দুরের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলো।

একঝাঁক পাখী নীড়মুখে উড়ে গেল। ওদের রঙ-বেরঙের পাখায় আকাশের নীল মাখানো উশ্রীর মনে হল ও যেন পাটনার ঝাঁপ সঙ্কীর্ণ পথে মোটরের নরম গদীতে বসে শীকারে চলেছে ওর হাতে বন্দুক, ও যেন ওই গ্রন্থের মেন নায়ক বনে গিয়েছে। এমনই একটি স্নিগ্ধ তন্দ্রায় ও আচ্ছন্ন হয়েছিল তখন।

"মায়জী আপনার চা আনব—"

সঙ্গোপনে

"নারে কাঞ্চী—সাহেবকে ফিরতে দে—" অর্কেট মালঞ্চের নিভৃত প্রান্তে সুবিন্যস্তে ছাঁটা সবুজ ঘাসের উপর সুন্দর পা দু'খানি অলস ভাবে রেখে, গেটের পিছন দিকের লনে কয়েকটি জড়ো করে রাখা ইঁটের উপর উশ্রী বসেছিল, বইখানা মুড়ে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কাঞ্চী দাসার দিকে তাকিয়ে ও বললো, 'ফিরতে কেন এত দেরী হচ্ছে বলতো, এমন তো কোন দিন হয় না—' ও চিন্তার মন্থর পায়ে বারান্দায় যেয়ে উঠলো। শ্বেত পাথরের টেবলটায় কনুয়ের উপর ভর করে ও দাঁড়াল, স্বামীর অফিসে রিঙআপ করবে বলে, মনে থাকা নম্বরটা ভালো করে মনে করতে ও ভ্রূদুইটি কুঞ্চিত করলো। ঠিক সেই সময় ক্রং ক্রং শব্দে ফোনটা ধ্বনিত হয়ে উঠলো।

"হ্যালো—, হ্যাঁ আমি উশ্রী—" রিসিভারটা তুলে নিয়ে উশ্রী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলো "কি হলো বলোত এখনও ফিরছোনা কেন ? গাড়ী ঠিক পৌচেছে তো ? কি বললে, পশ্চিম থেকে বন্ধু এসেছে ? তার বাড়ী যাচ্ছ ? কখন ফিরবে ? বল্‌তে পারছ না ? গাড়ী ফিরিয়ে দিলে গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাবো বলে—না না একা একা গঙ্গার হাওয়ায় মনটা বড় এলোমেলো হয়ে যায়—আমি পঙ্কজবাবুর রেকর্ড লাগিয়ে বসে রইলুম—দশটার ওদিকে গেলে কিন্তু গেট বন্ধ হয়ে যাবে। না-না সত্যি ঠাট্টার কথা নয়, সিরিয়াসলি বল্‌ছি,—শাঁখা, সিঁদুর, নোয়া সব ছুঁয়ে বল্‌ছি, দেখো আমার প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গে যেন নিজেরই অকল্যান টেনে এনো না।" প্রচুর হাসতে হাস্‌তে উশ্রী রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো।

কাঞ্চি ওইখানেই দাঁড়িয়েছিল, বল্‌লো, "লক্ষ্ণৌ থেকে মঞ্জীরবাবু এসেছেন মায়জী, আপনার সঙ্গে দেখা করবেন—"

"মঞ্জীরবাবু—মঞ্জু, মঞ্জুদা এসেছে ? কাঞ্চি বস্‌তে দিয়েছিস্ ওকে ?"

"দিয়েছি মায়জী,—লাউঞ্জ রুমে—"

"না—না যা ওকে আমার ঘরে এনে বসতে দে।" বুকের নিভৃত তন্ত্রীতে উশ্রীর করুণ অথচ মধুর এক সুর বেজে উঠলো অত্যন্ত সন্তর্পণে অত্যন্ত সঙ্গোপনে, হৃদয় রোমাঞ্চিত করে স্পন্দিত করে। মঞ্জীর—মঞ্জুদা আবাল্যের সহচর কৈশোরের দীক্ষাগুরু—যৌবনের স্বপ্ন, মঞ্জীর এসেছে—"ও ভাবলো" মন-মালঞ্চ যেদিন বসন্তের সমারোহে পুষ্পিত হয়ে উঠলো মনে হয়েছিল সেদিন, ও যেন পৃথিবীর ইন্দ্ররাজ শাপগ্রস্থ হয়ে ধরণীতে নেমেছে ওর মত সুন্দর এ জগতে বুঝি আর কেউ নেই। জীবনতরীর কাণ্ডারী করে ওকে পেতে কত আশা—কত আকাঙ্খা—স্মৃতির অথৈ জলে উশ্রী উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল, কাঞ্চি বললো "বসতে দিয়েছি মায়জী আপনার ঘরে—"

চম্‌কে উঠলো উশ্রী ওর কপালে তখন মুক্তোর সারির মত ঘাম ফুটে উঠেছে, গালের একটা পাশও বুঝি ঈষৎ রক্তিম হয়েছে নিশ্বাস দ্রুত পড়ছে। ত্রস্তে নিজেকে সংযত করে নিয়ে ও দেওয়ালে ব্র্যাকেটে আয়না চিরুণী ছিল সংস্কৃত চুলগুলি আরও বিন্যস্ত আরও পরিপাটি করে, শাড়ীটা ওর দু'এক টানে গুছিয়ে নিয়ে সুমুখের হল অতিক্রম করে নিজের শোবার ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলো।

একখানা কাউচে মঞ্জীর বসেছিল, টানছিল সিগ্রেট দরজার দিকে তাকিয়ে। উশ্রীকে দেখে সুন্দর দীর্ঘ পল্লবিত চোখ দুটি স্মিতহাসিতে উজ্জ্বল করে ফুল্ল দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বললো "ভেবেছিলুম দরোয়ানের হুঙ্কার খেয়েই বুঝি ফিরে যেতে হবে—ভালো আছতো উশ্রী— ?

"সে ভয় তো এখন ভেঙ্গেছে মঞ্জুদা?" ওর পাশের সোফায় বসে মৃদু হেসে উশ্রী বল্‌লে, "কেমন আছি তুমি দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই, কিন্তু একী তোমার চেহারা হয়েছে বলত? শরীর কি ভালো নেই? কবে ফিরলে কোলকাতা?"

উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠে মঞ্জীর বল্‌লো, "শুধু ভয়ই ভাঙ্গেনি উশ্রী, তোমার বীরত্ব দেখে আমার পুলকে যেন ভেঙ্গে পড়তে ইচ্ছে করছে। তুমি বাঙ্গালীর মেয়ে শতকরা নিরানব্বইটা মেয়ের মত স্বামীর কাছে সতীগিরি ফলাতে 'ওকে চিনিনে'—না ব'লে আমায় তোমার শোবার ঘরে অভ্যর্থনা করলে, নিতান্ত এক পুরোনো বন্ধুর পক্ষে এ পাওনা নিশ্চয়ই তার অপর্যাপ্ত সৌভাগ্য আর সম্মানের পরিচয় নয় কী?" কয়েক মুহূর্ত্ত থেমে সিগ্রেটে কয়েকটি টান দিয়ে মঞ্জীর বল্‌লো, "তুমি যে ভালো আছ, বিয়ের জল, অর্থাৎ স্বামীর ভালোবাসা পেয়ে রীতিমত ফুলে উঠেছ, সে তো দেখতেই পাচ্ছি; সোজা কথায় আমি বেশ ভালো আছি, এই, এই তো আজ সকালে মেঘালীর তাগাদায় অস্থির হয়ে প্রায় দুই বৎসর পর কোলকাতায় বেড়াতে এসেছি। সাগরবাবু ভাল আছেন তো?"

"না-না ওরকম করে শুধু ভালো আছি বোল না মঞ্জুদা, সত্যি করে বল তুমি কেমন আছ? তোমার স্বাস্থ্যে আর সে লাবণ্য নেই, শ্রী নেই, দীপ্তি নেই, সেই সুন্দর মুখটা বার্দ্ধক্যের ছাপে কী রকম যেন মলিন হয়ে গিয়েছে, কুচকে গেছে—তুমি তবে কী মেঘালীকে নিয়ে সুখী হতে পারোনি—" উশ্রী মঞ্জীরের হাতে উৎকণ্ঠার একটা মৃদু ঝাঁকানি দিল।

"সুখ তোমরা কাকে বল উশ্রী?" মঞ্জীর বলে উঠলো, "পুরোনো যা কিছু তাকে ধুলিসাৎ করে তারই উপর নূতনের সৌধ গড়ে তোলাই

কী তোমাদের সুখ নাকি ? মেঘালী আমায় খুব ভালবাসে কিন্তু তোমাদের মেয়েদের ভালোবাসাটাই একটু বিচিত্র ধরণের নয় উশ্রী ! তোমার বিয়ের পরই আর্ট কলেজের মাষ্টারী নিয়ে চলে গেলুম লক্ষ্নৌ, নিতান্ত আকস্মিক-ভাবে ছাত্রী মেঘালী ভালোবেসে ফেল্‌লো। একটা ছন্নছাড়া শিল্পী, যার চালচুলো নেই, ষ্টাইল নেই, সম্ভ্রম মর্যাদা ভদ্র সমাজের বলতে যার কিছুই নেই—তাকে প্রেম উৎসর্গ করলে কিনা, এক ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট মেয়ে—"

"বোস মঞ্জুদা তোমার চা নিয়ে আসি—" মঞ্জীরের অসম্পূর্ণ কথার মাঝেই হঠাৎ উশ্রী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, ওর শাড়ীর কুচকুচে কালো পাড়ের দিকে তাকিয়ে মঞ্জীর চাপা একটি নিঃশ্বাস ফেল্‌লে।

কিছুক্ষণ পর উশ্রী ফিরে এল হাতের সসারে কড়াইসুটির কচুরী ও চা-এর পেয়ালা টিপয়ের উপর নামিয়ে মঞ্জীরকে খেতে অনুরোধ করলো।

একখানা কচুরী তুলে নিয়ে মঞ্জীর বল্‌লো, কাঁদতে বুঝি উশ্রী তাড়াতাড়ি বাইরে চলে গেলে ? আবার যে দিন বলেছিলুম, উশ্রী ভেসে যাক সংসার, ভেঙ্গে যাক সমাজ, তবু চল আমরা বিপর্যস্ত পথের বাধা চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়ে আমারা নূতনের সন্ধানের পথে পাড়ি দেব কিন্তু তখনও শুধু কেঁদেছিলে' কচুরী চিবুতে চিবুতে মঞ্জীর একদৃষ্টে উশ্রীর সজল স্নিগ্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

এইবার রীতিমত রুক্ষভাবে উশ্রী বল্‌লো, এমন করে তুমি চিরকাল আর খোটা দিও না মঞ্জীর, তোমরা শুধু প্রেমের উপাসক, প্রীতি পুষ্প দিয়ে অর্ঘ্য রচনা কর, উৎসর্গ করেই তা উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠো আমরা

কিন্তু তা নই শুধু উপাসিকা, শুধু পূজারিণী নই, প্রহরীর মত রক্ষা-কর্তার মত তোমাদের অঞ্জলী ভরা স্তবকের একটি পাপড়ীও না শুকিয়ে পড়ে যেন তারই নিরন্তর সাধনা করি; সন্ত্রস্ত ভরে তার সঙ্গেই মন্দিরের পূজানুষ্ঠান সমাপ্ত করি; তাই সেদিন তোমার কথায় সম্মত হতে পারিনি। ভেবে দেখেছিলুম, আমাদের কাননে যে কিশলয়গুলি ফুটে উঠবে, কেন তারা দল মেলে ওঠার পথেই বিবর্ণ হবে, ম্লান হয়ে যাবে বাপ মায়ের কলঙ্কে কেন তারা কলঙ্কিত হবে? কেন দুর্বিসহ ঘৃণা আর অবজ্ঞার জীবন বইবে? নাও চা-টা যে জুড়িয়ে যাচ্ছে খেয়ে নাও, গাড়ী বের করতে বলে এসিছি, যাবে বেড়াতে? চল না প্রিন্সেস ঘাটে জেটিতে গিয়ে একটু বসি।

"চল তাই গঙ্গার হাওয়াতেই মাথাটা তোমার ঠাণ্ডা হতে পারবে" চায়র কাপটায় নিঃশেষে একটা চুমুক দিয়ে, সিগ্রেট কেশের উপর একটি সিগ্রেট ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে উঠে দাঁড়িয়ে মঞ্জীর বল্‌লে, আর যদি লেকচার কিছু দাও না হয় নোট বুকে তুলে রাখবো, যে সব নব্য আর নব্যা তরুণ তরুণীরা প্রেমের জন্য বিরাট স্বার্থত্যাগ করতে পারে না, লক্ষ্ণৌ ফিরে গিয়ে একটা সভা করে এবার সেই বক্তৃতাই দোব।

শাড়ীর আঁচলে মুখ মুছে ফেলে উশ্রী একটু হাসলো, যেন ভিজে কাঠে উনুনে অগ্নি সংযোগ হয়েছে, ধুম কুণ্ডুলি স্তূপীকৃত কয়লার ফাঁকে ঈষৎ আলোর আভাষ জাগলো।

* * * * *

সঙ্গোপনে

পার্কসার্কাশ সার্কুলার রোড অতিক্রম করে চৌরঙ্গীর এক মুখরিত প্রান্ত ধরে অশ্রান্ত পায়ে গাড়ী ছুটছে, অস্তমিত বিকেল তখনও জ্যোতির্ময় আলোয় দিগন্তের গায়ে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে তবু পথের দুপাশে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে উঠেছে, যেন দুই আলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে।

ওরা দুজনে মাঝে মাঝে দুএকটা কথা বলছে, এলোমেলো ওদের সে ভাষা, স্মৃতির ভারেই মন বিপর্যস্ত।

কখন যেন অজ্ঞান্তে উশ্রী ওর একখানা হাত মঞ্জীরের কোলে রেখেছে, নিতান্ত আনমনা ভাবে এক সময় ওর হাতে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মঞ্জীর বললো, উশ্রী তুমি সাগরবাবুকে খুব ভালবাস না ?"

মঞ্জুদা, স্বামীকে কোন মেয়েই বা ভালো না বাসে বল ? কারও ভালোবাসায় হয়তো বা থাকে প্রাণের একটা অবিচ্ছিন্ন যোগ, আন্তরিকতা ; কারও বা নিছক কর্তব্য পালন, কারও ভালোবাসা জীবনের রঙ্গমঞ্চে শুধু অভিনয়ের প্রতীক হয়েই পরিসমাপ্তিতে মূর্ত হয়ে উঠে।"

"তোমার" ? মঞ্জীরের কণ্ঠস্বরে ঔৎসুক্য ঝরে পড়লো।

উশ্রী বল্‌লো, আমার কথা আমি কখনও চিন্তা করিনি মঞ্জুদা, হয়তো বা একদিন জীবনের মুকুলিত মুহূর্তে ক্ষুদ্র শক্তি আর সামর্থ্য নিয়ে ভাববার চেষ্টা করেছিলুম, ভালো বাসা কী ? মানুষ ভালোবাসে কেন ? কিন্তু সে ভাবনা সবেমাত্র আমেজ মধুর হয়ে উঠতে না উঠতে স্বপ্নের মদির জাল ছিঁড়ে গেছলো। এখন শুধু অনুভব করি স্বামীকে ভালো লাগে, তাঁর কথা, তাঁর দৃষ্টি, তাঁর ভালোবাসা গভীর তৃপ্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে উপভোগ করি, মনে হয় এইটুকু ছাড়া বুঝি মেয়েমানুষ এক পা চলতে পারে না, তাই নারী পুরুষের অনুকম্পার আশ্রয়ী, চিরকালের,

চিরযুগের।" আশ্চর্য তোমাদের দুজনের মনের সামঞ্জস্য উশ্রী—'
মাথাটা কাৎ করে গদীর পিঠে বেশ ভালো করে হেলান দিয়ে বসে মঞ্জীর বললো,—"সেই কথাও মেঘালী বলে—ও নাকি যৌবনের বিকশিত লগ্নে এক সহধ্যায়ী তরুণকে ভালো বেসেছিল, তখন ওর মনে আশা আকাঙ্ক্ষা অসীম; চেয়েছিল ছেলেটি ওকে বিয়ে করে বিলেতে আরও পড়তে যাবে, কেননা বিলিতি ডিগ্রিই ওর যোগ্য সম্মান এই কথাই ও মনে করতো। কিন্তু সে সম্ভব হয়ে উঠলো না, সহপাঠী বললেন, "ভালো যদি বেসে থাকো, এই দেশী ডিগ্রীধারী ছেলেকে বিয়ে কর—, নইলে কোব না। কিন্তু মেঘালী তা শুনলোনা, বি, এ, পাশ করে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করবে বলে, চিত্র আর্টের সাধনা করতে চলে গেল লক্ষ্মৌ।"

"তারপর," উশ্রী বলে উঠলো, "শিবের সুন্দর কান্তি তার ব্রহ্মচর্য ভেঙ্গে দিল, সতীকে ভুলতে শিব গেছলেন তপস্যা করতে, উমা দিলেন তার তপস্যা ভেঙ্গে কেমন এই তো?"

মৃদু হেসে মঞ্জীর বল্লো, "সে যুগে শিবের তপস্যা ভেঙ্গে উমা কী বলেছিলেন জানিনে, এ যুগের উমা বল্লেন আমায়, নারীকে জয় করতেই ঈশ্বর কি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অদ্ভুত তোমাদের আকর্ষণী শক্তি; আমার ব্রহ্মচর্য ভাঙ্গলে, সংযম ডুবালে—"

গাড়ীটা তখন ময়দানের পথে বাঁক নিচ্ছিল, হঠাৎ উশ্রী বলে উঠলো, "মঞ্জুদা, চলনা তোমার বাড়ী, তোমার বউকে ভারী দেখতে ইচ্ছে করছে"

"বেশ তাই চল", মঞ্জীর বল্লো, "বাড়ী নয় উশ্রী ক্যালকাটা হোটেলে উঠেছি"

সোফার গাড়ী আবার সিধে চালালো।

কয়েক মিনিটের মধ্যে ওরা এসে থামলো, হোটেলের সুমুখে, উশ্রীকে নামিয়ে, একতলা পার হয়ে দ্বিতলে সিঁড়ির পাশেই একটা ঘরের স্ক্রীন সরিয়ে "এস উশ্রী" মঞ্জীর বললো। ঘরের ভিতরে একটি বড় কাউচে পাশাপাশি মেঘালী আর উশ্রীর স্বামী সাগর বসেছিল, মেঘালীর দিকে তাকিয়ে মঞ্জীর বললো, "ইনিই আবাল্যের সহচরী উশ্রীদেবী যাঁর কথা একদা তোমায় বলেছিলুম। ইনি আমার স্ত্রী মেঘালী, তুমি বুঝেছ নিশ্চয়ই উশ্রী।"

মেঘালী উঠে, সাদর অভ্যর্থনায় হাত ধরে উশ্রীকে বসালো, সাগরকে দেখিয়ে স্বামীকে বললো, "ইনি আমার সহধ্যায়ী সাগর রয়, ইনি আমার স্বামী আর্ট কলেজের প্রফেসর শিল্পী মঞ্জীর সেন—, বুঝেছ তো সাগর।"

সাগর তখন এক দৃষ্টে উশ্রীর দিকে তাকিয়েছিল, উশ্রীর চোখ স্বামীর মুখে নিবদ্ধ। মঞ্জীর ওদের পরস্পরের পরিচয় মেঘালীর কাছে পরিষ্কার করে দিল, ওরা তখন সবাই এক সঙ্গে হেসে উঠলো। অভিবাদন, প্রত্যাভিবাদন বিনিময় করলো, যেন ক্ষণকালের জন্য এক টুকরো লঘু মেঘ ভেসে উঠেছিল শরতের স্বচ্ছ আকাশে, বন্দ্রের ঝিঁকিমিকিতে আকাশ গেল পরিষ্কার হয়ে, জ্যোতির্ময় আলোয় দিগন্ত রঙিন হয়ে উঠলো। তখন পাশের বাড়ীর রেডিওতে সন্ধ্যের প্রোগ্রামে শীলা সরকারের গান বাজছে,"

কোনও কথা কেহ পারে নি
বলিতে কী জানি কেন—
কে কহিবে আগে, ছিনু তারই লাগি
দুজনে যেন, দুজনে যেন।"

দ্রুত পায়ে বাইরে চলে গেল। কিন্তু ওর আদেশ পালনের কোনও লক্ষণই অভ্রর মধ্যে দেখা গেল না। অনুজার পত্রখানা ও বোধ হয় কাল থেকে বার পাচ ছয় পড়েছে, আবার সে সেখানা টেবিল থেকে তুলে নিল।

ক্ষমা লিখেছে—

"দাদা, তোমাকে কতদিন দেখিনি,—কী ভীষণ যে দেখতে ইচ্ছে করে—, কী বলবো তোমায়। সেই বিয়ের পর থেকে তিনটি বৎসরের বন্দী জীবনের আবর্তে আমি যেন হাঁফিয়ে উঠেছিলুম। কতদিন মনে হয়েছে ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার দিনটাতে তোমার কপালে একটী জয়েব তিলক পরিয়ে দিতে তোমায় ডেকে আনি—, কিন্তু সে সংসারে সে অধিকারেও আমি বঞ্চিতা ছিলাম। আচ্ছা দাদা, তুমি বলতে পারো, মেয়ে মানুষের কোনও সত্ত্বা বা কোনও অধিকার বলতে কোথাও কিছু আছে কী? এই দেখ না কতদিন পর বাপের বাড়ী এসেছি—, তাও যেন মনে হচ্ছে আমার এখানকার আবাল্যের সব সত্ত্বা, দাবী কে যেন আত্মসাৎ করে নিয়েছে। পদে পদে একটা কুণ্ঠা অনুভব করি। তাই মনে হয় সত্ত্বা আমাদের কোথাও কিছু থাক্ বা না থাক্—তবু তুমি এই বোনটিকে সুখী করতে কত না চেষ্টা করেছিলে। আমি বড় ঘরে পড়বো, আনন্দে, সুখে সম্ভোগে থাকবো বলে—, সে বছর নূতন লব্ধ চাকরী ছিল তোমার—, তাও বিস্তর ঋণের বোঝা মাথায় তুলে নিয়েছিলে। কিন্তু তোমরা করবে কী? ভাগ্য যে আমার সুখের প্রতিকূলে, তাই বুঝি শৈশবেই জননীকে হারিয়েছি,—সুখ, সৌভাগ্য, দাবী সব কিছুকে বিসর্জন দিয়েও মেয়েমানুষের সহায় সম্বলের একমাত্র যে স্থান সেই স্বামী গৃহও বুঝিবা হারাতে বসেছি। প্রায় তিনবৎসর পর ওরা

আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে, হয় তো বা চির জন্মের মত বিদায় করেছে। কেন তা বলি শোনও—'তুমি একথা জানো না বোধ হয়, আমার বিয়ের কিছু পণের টাকা কম পড়েছিল বলে, 'ওরা আমায় এই তিন বৎসর আটকে রেখেছিল। কিন্তু এতেও এরা প্রতিশোধ নিয়ে তৃপ্তি পেলো না। অনেকদিন থেকে টাকাগুলো সুদে আসলে তোলবার অর্থাৎ ছেলের আবার বিয়ে দেবার ফন্দী খুঁজে বেড়াচ্ছিল। সম্প্রতি বুঝি তা পেয়েছে। কয়েক মাস হোল, আমার মেয়েটী হবার পর থেকে আমি বড় বেশী জ্বরে ভুগ্‌ছিলুম, তার কিছুদিন পর দেখা গেল, আমার ডান পায়ের পাতার্ উপর একটী সাদা রঙের গোল আকৃতি ফুটে উঠেছে। ওরা তা দেখে শিউরে উঠলো. বল্‌লো—আমার নাকি কুষ্ঠব্যাধি হয়েছে—সে রোগ বংশের কলঙ্ক, ছেলের আবার বিয়ে দেবে, ইত্যাদি। কিন্তু দাদা, ওদের কথা আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না—, তুমি যদি একটীবার এসে দেখে বল, সত্যই কী আমার 'ওই রোগ হয়েছে—"

অভ্রর এই পযন্ত চিঠিখান' পড়া হয়েছিল, এমনি সময় দুয়ার প্রান্তে কতকগুলি লোকের পায়ের• শব্দ, কথার গুঞ্জন শুনে চোখ তুলে দেখলো—রোগীপত্রের ভীড়ে বারান্দা ভর্তি হয়ে গিয়েছে। তারাও সরকাবের নিম্নস্তরের কর্ম্মচারী, নির্দ্দিষ্ট সময় ডাক্তারবাবুকে, ডাক্তারখানায় না পেয়ে তার কোয়ার্টার্সে এসে উপস্থিত হয়েছে।

স্ত্রীর তাগাদা অভ্রকে তার কর্তব্য সম্বন্ধে চকিত কোরে তুল্‌তে না পারলেও, এই লোকগুলোকে তার মনে হোল যেন মূর্তিমান তাগাদারই বিকট রাক্ষসের রূপ তারা, হাঁ করে তাকে গিল্‌তে আস্‌ছে। সে সর্বপ্রথম বাথরুমে যাবে—, না চা খাবে, না পোষাক পরিধান করবে;

ঠিক করতে না পেরে ধমকের উত্তপ্ত কণ্ঠে রোগীগুলোকে বলে উঠলো—, 'ডাক্তারখানায় গিয়ে বসগে—একটু পরে যাচ্ছি—'

*   *   *   *

ডিউটীতে এসে সর্বপ্রথম অভ্র রোগীগুলোকে পরীক্ষা করে, ব্যবস্থা-পত্র, সিক্ সার্টিফিকেট প্রভৃতি লিখে দিয়ে, তাদের বিদায় করে নিশ্চিন্তের একটী নিশ্বাস ফেলে ছুটীর দরখাস্ত করবার কাগজপত্র বের করলো। কিন্তু দরখাস্ত যে সে কী করবে, ছুটীর প্রয়োজন কেন তার কী কারণ দেখাবে সে এক রীতিমত সমস্যা ! সত্য বিষয়টী বল্‌তে গেলে ছুটি যে মঞ্জুর হবে না, সে কথা সে জানে। কারণ চাকরী যখন সে করছে—তখন বাপ, মা ভাই, বোন কারও সম্বন্ধেই তার চিন্তা করবার কোনও অধিকার নেই। সুখ, আনন্দ, জীবনের বৈচিত্র্য এইগুলি উপভোগ করা তো তাদের পক্ষে নিতান্ত ভাবেই অপরিহার্য— ; সুতরাং— ?

শেষ পর্যন্ত অনেক ভেবে অভ্র লিখলো—'স্ত্রী আসন্ন সন্তান সম্ভাবনা, তাকে বাড়ী রাখতে যাওয়ার জন্য—দিন দশেকের ছুটির বিশেষ প্রয়োজন'।

'কিন্তু', "কিন্তু—" দরখাস্তখানা খামে ভরতে ভরতে সংশয়ে অভ্রর মন দুলতে লাগল।

ছুটি পাওয়া সম্বন্ধে ওর মনটা যখন এমনই সংশয় আকুল এবং বিপর্যস্ত, —সেই সময় সরকারী এক কর্মচারী পার্শেল ক্লার্ক ললিতবাবুর ভৃত্য ঘরে এসে বললো,—'ডাংদারবাবু, বাবুজি বলিয়া দিছেন, বাসায় একবার যেতে, দিদিমণির বোখার বড় বাড়িয়া চলিছে।"

রুক্ষকণ্ঠে অভ্র বলে উঠলো—'সে তো একমাস থেকে দেখতেই পাচ্ছি,

সরকারী ডাক্তারখানার ওষুধে কখনও রোগ সারে? কতদিন থেকে বল্‌ছি, বাইরে থেকে ওষুধ কিন্‌তে, তা তোমরা কিনবে না, শুধু ডাক্তারের বদ্‌নাম দেবে'—

ভৃত্যটী তার প্রভুকে বল্‌বার মত কোনও যোগ্য উত্তর না পেয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'বাবুকে গিয়ে কী বল্‌বো, বাবুজি?'

'বলবে,—আমার মাথা আর মুণ্ডু' নিজের মনের অভ্যন্তরে অভ্র বলে উঠলো,—'ডিপেনডেণ্ট কেস, পয়সা কড়ি দেবে না, কিছু না; শুধু কর্তব্য আর কর্তব্য।

ভৃত্যটীর ব্যগ্র মুখের দিকে তাকিয়ে সে বল্‌লো, 'বাবুকে বলে দাও, কাজ কর্ম সেরে যাবো।'

সে, চলে যেতে, অভ্র দরখাস্তখানা টেব্‌লে পেপার ওয়েটের তলে রেখে, কলমটা আবার তুলে নিল,—ক্ষমার শ্বশুরকে সব কথা খুলে একটা চিঠি লিখবে বলে।

*　　　*　　　*　　　*

ষ্টেশনের প্রায় সংলগ্ন অগুন্‌তি সারি বাঁধা সরকারী কোয়াটার। কবুতরের খোপও বলা চলে। তিন হাত লম্বায়, তিন হাত প্রস্থে উপর নীচে দুখানি ঘর, একটুক্‌রো বারান্দা ও রান্না ঘর এবং পায়খানা সহ বাড়ীগুলোতে একযোগে যখন চুল্লী প্রজ্জলিত হয় এবং ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় মিতালী বন্ধন বেশ প্রগাঢ় হয়ে ওঠে; তারই সঙ্গে আবার ইঞ্জিনের ধূমেরও যোগসূত্র স্থাপনের বেশ একটা ঔৎসুক্য দেখা দেয়,—তখনও সেই গৃহে মানুষনামীয় জীবগুলোই বাস করে। এমনি একটী গৃহে

প্রবেশ ক'রে, অভ্র দেখলো বারান্দার ধাপের উপর ললিতবাবু বসে রয়েছেন। পঁয়তাল্লিশ বৎসরের ললিতবাবুর দিকে তাকিয়ে অভ্রর আজ মনে হোল, তিনি যেন অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন,—তিনি যে সাতটী কন্যা সন্তানের কেরাণী-বাপ, তার সুস্পষ্ট পরিচয় তাঁর দীনতম চেহারায় প্রত্যক্ষ মূর্ত হয়ে উঠেছে।

ললিতবাবু গভীর ঔৎসুক্যের সঙ্গে ডাক্তারেরই প্রতীক্ষা করছিলেন। অভ্রকে দেখে সুখী হয়ে বলে উঠলেন,—'এই যে আসুন, ডাক্তারবাবু,—আপনার জন্যেই বসে আছি,—মেয়েটার জ্বর উত্তরোত্তর বেড়েই যাচ্ছে। এদিকে দেখুন বেশ ভালো একটা সম্বন্ধ স্থির করে ফেলেছি, জ্বরটা না ছাড়লে সব কাজ পণ্ড হয়ে যাবে। বয়স আপনার কাছে গোপন আর করবো কী? চব্বিশও পার হতে চল্‌লো;—দিন্ তো এবার লিখে কী ওষুধ যেন দেবেন বলছিলেন,—খাওয়াই এনে, অন্ততঃ জ্বরটা যা'তে ছেড়ে যায়,—যেন কণে সাজিয়ে লোকের সামনে বের করতে পারি;—ওরে সতী কোথায় গেলি, আয় না রে, ডাক্তারবাবুকে একবার ভালো করে দেখা না এসে'—ললিতবাবু ডাক্তার অভ্রকে নিয়ে গিয়ে কক্ষস্থ তক্তোপোষে বস্‌তে দিলেন। কিছুক্ষণ পর সতী ঘরে এল, তার চলার দুর্বল ভঙ্গিমায়, ক্লান্ত দৃষ্টিতে, শীর্ণ চোখের তটে রোগের প্রকাশ্য অভিজান বেশ সুরু হয়েছে। অভ্র তার নাড়ীর স্পন্দন পরীক্ষা করে, বুক পরীক্ষা করতে লাগল। ললিতবাবু কিন্তু তখনও মুখরকণ্ঠে বলেই চলেছেন,—'ভালো পথ্য, দামী ওষুধ কার না আর ছেলেমেয়েকে দিতে সাধ যায় বলুন? এই যে আপনাকে কখনও ফি দিই না এর জন্য আমার কী কম লজ্জা;—কিন্তু আপনি আমার সংসারের আয় ব্যয়ের হিসেবটা শুনলেই আমার অবস্থাটা কতকটা অনুভব করতে

পারবেন। মাইনে পাই পঁয়তাল্লিশ—দেশের ঘরখানা তুলতে কিছু ধার করেছিলুম,—তাই নানারকম কেটে কুটে হাতে আসে আমার ত্রিশ;—এখন বুঝুন সেই ত্রিশটা রৌপ্য মুদ্রা দিয়ে, এই বৃহৎ পরিবারের পক্ষে কেমন করে সঙ্কুলান সম্ভবপর হয়? তারপর তুমি খেতে পাও, অথবা মরে যাও, নানা তহবিলে তোমাকে সাহায্য করতেই হবে। ভাবুন তো একবার আজকের সুযোগে, কারবারী লোকগুলো একেবারে ফেঁপে উঠলো, মরণদশা কেবল চাকুরী-জীবিদেরই। আচ্ছা ওই হিটলার ব্যাটাকে গুলি করে মারা যায় না?—এবার না হয় আসুন ওর সঙ্কল্পে আমরা মরণ যজ্ঞ ব্রত সুরু করে দিই'—

ললিতবাবুর কোন কথাই অভ্রর কানে প্রবেশ করছিল না সে তখন পকেট থেকে কলমটা বের কোরে ভাবছিল। কী বা এ মুমূর্ষু রোগীর জন্য প্রেসক্রাইব করবে সে? পূর্বে যে ওষুধ কয়টা দিতে চেয়েছিল,—এখন তার পক্ষে তা কার্যকরীও হবে না; আর বর্তমানের এই পরিস্থিতিতেও কী তার যোগ্যতর ওষুধগুলো পাওয়া এবং কিনে ওঠা সম্ভব হবে? সুতরাং—

* * * *

সেইদিন কাজ কর্ম সেরে অভ্রর বাড়ী ফিরতে,—রোজকার চেয়ে অনেক বেশী বেলা হয়েছিল। দ্বিপ্রহরের আহার এবং বিশ্রামের পর গোপা জিজ্ঞেস করলো স্বামীকে—'ছুটীর দরখাস্তখানা পাঠিয়ে দিতে আজ ফিরতে বোধ হয় এত বেলা হোল, নয়?'

অভ্র বল্‌লো,—'ললিতবাবুর মেয়েকে দেখতে যেতে হয়েছিল,—তারপর আরও কয়েকটা কেশও এসেছিল।'

সঙ্গোপনে

গোপা বল্‌লো,—'ললিতবাবু তো কতদিন হোল ওষুধ কেনবার আতঙ্কে তোমাকে ডাকেন নি? আবার হঠাৎ যে তাঁর ডাক্তার-প্রীতি বেড়ে গেল?—কেমন দেখলে সতীকে? সত্যি মেয়েটার জন্ম বড় কষ্ট হয়। একটু থেমে গোপা বললো জীবনের সুন্দর মুহূর্তগুলি তার এমনি চলে গেল বলে কত দুঃখ সে আমার কাছে নিত্য করে, বলে, পড়াশুনা করলে কত কী সে শিখ্‌তে, জান্‌তে পারতো; তবু আশা রেখেছিল, ভালো ঘরে বরে ওর বিয়ে হবে। ধনী অথবা খুব শিক্ষিত স্বামী সে আশা কখনও করেনি,—শুধু চেয়েছিল ওর বরটা হবে বেশ চরিত্রবান আর বয়সের ওর সঙ্গে খুব বেশী ব্যাবধান থাকবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী না একটা দ্বিতীয় পক্ষ; নিশ্চয়ই ভদ্রলোক রীতিমত বুড়োই হয়েছেন। বলতে বলতে গোপার কণ্ঠস্বর অবরুদ্ধ হয়ে এলো।

ওকে সান্ত্বনা দিয়ে অভ্র বল্‌লো,—'এর জন্ম তুমি দুঃখ কোর না গোপা, কারণ এ-কষ্ট তাকে বেশী দিন সইতে হবে না, বুড়ো বর নিয়ে ঘর করবারও জীবনের মেয়াদ তার ফুরিয়ে এসেছে। আজকে ত ওর লাঙ্গ্‌সের আমি কোন অস্তিত্বই পেলাম না—'

গোপা বল্‌লো,—'তুমি তো একথা অনেকদিনই বলেছিলে; যাক্ এই তবু সান্ত্বনা মৃত্যুর আসন্ন মুহূর্তেও বিবাহ ওর হবে, বাপকে কন্যাদায় থেকে মুক্ত ও করবে; শাঁখা সিঁদূর চেলী ও পরবে,—কম্পিত হাতে বরকে মাল্যদানও করবে,—কনে আসনে বসে হয় তো বা শুভ দৃষ্টির সময় তার দিকে চোখ তুলে তাকাতে গিয়ে সে—বাকী কথাটুকু ওর ক্লিষ্ট হাসির মধ্যে নীরব হয়ে গেল।

*   *   *   *

সঙ্গোপনে

ছুটীর দরখাস্ত লেখার মধ্যে অভ্র যতই কারসাজি করুক না কেন,—তবু তা মঞ্জুর হ'তে কয়েকটা দিন বিলম্ব হয়ে গেছলো। আসাম এবং বাঙ্গলার সুদূর ব্যবধান দীর্ঘ পথ পুরোপুরি তিনটী দিনে অতিক্রম ক'রে একদিন সকাল বেলা ওরা বাড়ী পৌছুলো। অভ্রর পিতা ওর জননীর মৃত্যুর বহুদিন পর দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলেন। অভ্র তার কর্ম্মস্থলে থাকতে এই সংবাদ পেয়েছিল এবং পিতার উপর অভিমান বশতঃ হোক্ অথবা যে কারণে হোক্, তারপর থেকে সে আর বাড়ী আসেনি। ক্ষমার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করেই গেছলো, নির্দিষ্ট দিনে প্রবাস থেকেই অর্থ সাহায্য পাঠিয়েছিল। এবং বৎসর দুই পর পিতার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠান কর্মস্থলে সুসম্পন্ন ক'রেছিল।

বাহির বাড়ী পার হয়ে ভিতরের উঠোনে গিয়ে অভ্র দেখলো, রান্নাঘরের সম্মুখস্থ বারান্দায় বসে একটী পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসরের মহিলা এক ধামা কাঁঠাল বিচির খোসা ছাড়াচ্ছেন। পরণে তাঁর আধময়লা শুভ্র একখানা থানধুতি, মাথার চুলগুলি ছোট ছোট কোরে ছাঁটা, তনুশ্রী ঘিরে একটা সুকুমার সৌন্দয যেন স্বর্গীয় সুষমায় তাঁকে পবিত্রতর কোরে তুলেছে। লাবণ্যঢালা সুন্দর কোমল আননখানি যেন কল্যাণেরই চিত্রখানি মূর্ত্ত হয়ে রয়েছে। কয়েকটা মুহূর্ত্ত তাঁর দিকে তাকিয়ে অভ্র বুঝতে পারলো, ইনিই তাঁর নূতন জননী। ওরা বারান্দার দিকে এগিয়ে গেল। মহিলাটী কিন্তু এরূপ আচমকা ভাবে একটি অপরিচিত তরুণ যুবককে ভিতর বাড়ীতে আস্‌তে দেখে বিব্রত হয়ে মাথার কাপড় আরও খানিকটা টেনে দিয়ে রান্না ঘরে চলে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় ক্ষমা ছুটতে ছুটতে এসে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলো, 'দাদা তুমি এসেছ? সত্যি আমি কিন্তু মোটেই আশা

করিনি ; মা তুমি চলে যাচ্ছ কেন ? এই তো আমার দাদা—বৌদি, দাদা তুমি মাকে তো দেখনি, ইনিই আমাদের নূতন মা'।

সম্পর্কে জননী হলেও তাঁর বয়সের অল্পতার জন্য অভ্র তাঁকে প্রণাম করতে প্রথমটা ঈষৎ কুণ্ঠা অনুভব করলো, কয়েকটা মুহূর্ত পর সঙ্কোচটাকে আয়ত্তাধীন করে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে আনত হয়ে সে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করলো।

আশীর্বাদ কোরে জননী বল্লেন, 'তুমি তো বাবা বাড়ী আসা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছ, শুনি তোমাদের রাগ, অভিমান যত কিছু সে সব আমার উপরেই। সৎ-মা যে কখনও দরদী হয় না একথা হয়তো বা সত্যি, আমার কিন্তু মনে হয় সত্য নাও হতে পারে, সংসারের চিরন্তন প্রচলিত ওটা একটা কথা মাত্র ; কারণ আমি তোমাদের কখনও পর ভাবতেই পারি না। সকল সময় মনে হোত, আমি এমন কি অপরাধ করলুম, যার জন্য অভ্র তার নূতন মাকে একবার চোখের দেখাও দেখলো না ; তারপর তুমি যখন ওঁর শ্রাদ্ধ শান্তিগুলোও বিদেশেই সারলে তখনত সব আশা ভরসা ছেড়ে দিলুম।'

এ কথার অভ্র যোগ্য উত্তর খুঁজে না পেয়ে সত্য কথাই বল্লো, 'বাবা যে অত শীঘ্র মা'র স্মৃতিটা,—ভাবতেও যে বড় কষ্ট হোত মা'।

'কিন্তু তুমি স্মৃতিটাকেই শুধু বড় কোরে দেখছো যে বাবা,—আমাদের বাঙ্গালীর দরিদ্রের ঘরে যার মর্যাদা মোটেই রাখা চলে না। কিন্তু তাঁর মহত্ত্বটার দিকে একবার যদি দেখো, তবে বুঝতে পারবে, আমার একটা গতি তিনি কোরে দিয়ে গেছেন বলেই তো আজ আমি এই মাথা গোঁজবার ঠাঁইটুকু পেয়েছি, তা না হলে মামার গলগ্রহ হয়ে,"—

একটু থেমে জননী বল্লেন, 'যাক্‌গে সে কথা, এদিকে দেখনা মেয়েটাকে নিয়ে কী বিভ্রাটে পড়েছি, ওরা আবার বল্‌ছে ছেলের বিয়ে দেবে—; ওরে ক্ষমা, কোথায় গেলিরে, দেখা না তোর পায়ের দাগটা দাদাকে এসে,—বউমার সঙ্গে দুটো কথা বল্‌তেও পেলেম না, কোথায় যে তাকে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে গেল,—তুমি মুখ হাত ধোও অভ্র, আমি যাই একবার ওদের খোঁজ করে আসি—

মা চলে গেলেন, কিন্তু অভ্রর ওঠবার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। ওর দৃষ্টির সুমুখে তখন পিতার একখানি নম্র সমাহিত মুখ ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হয়ে উঠছিল, গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগে তাঁর প্রতি ওর বিদ্রোহ মন ক্রমশঃ শান্ত ও নমিত হয়ে এল। ও ভাব্‌লো, সত্যই সে এতদিন পিতার উপর নিরর্থক অভিমান করেছিল, ভুল বুঝেছিল তাঁকে; তিনি তার জননীর স্মৃতি রক্ষা না কর্‌লেও, একটী সংসার অনাদৃতা মেয়েকে বিবাহ করে যে বিরাট প্রাণের পরিচয় দিয়ে গেছেন, তার তুলনা বুঝি কিছুর সঙ্গেই চলে না। কয়েকটী বৎসর পর থেকেই তার নূতন জননীর কঠোর বৈধব্য যন্ত্রণা সুরু হলেও, তবু তো তিনি কিছুদিনের জন্যও সাধব্য জীবন ভোগ করতে পেরেছিলেন।

সুতরাং—?

* * * *

দুপুর বেলার খাওয়া দাওয়ার পর অভ্র ক্ষমাকে খুব ভালো ক'রে পরীক্ষা করে দেখে ওর শ্বশুর গৃহের ধারণা যে সম্পূর্ণ ভুল—একথা সে জোর কোরে ঘোষণা কর্‌তে সাহস পেল।

সঙ্গোপনে

ক্ষমার শ্বশুর বাড়ী এখান থেকে প্রায় ছয় ক্রোশ দূরে,—নদীতে যেতে হয়, কাল প্রত্যুষেই অভ্র ওর শ্বশুরের কাছে রওনা হয়ে পড়বে।

এক সময় ক্ষমা বল্‌লো, 'আচ্ছা দাদা তোমার এত কল্পনা জল্পনা, আব ইতিমধ্যে তুমি গিয়ে যদি দেখো'—

ওর কথা শেষ না হোতেই প্রচুর হাস্‌তে হাস্‌তে অভ্র বল্‌লো,—'শ্যামলের বিয়ে হয়ে গেছে, কেমন? না রে তা হবে কেন? সত্যি অফিসও ছুটীটা দিতে বড় দেরী করলো—; তবে আমি তার শ্বশুরকে লিখে দিয়েছি, অন্ততঃ আমি যাওয়া পর্যন্ত ওরা যেন শুভ কাজটা স্থগিত রাখে।'— যথেষ্ট উৎসাহের সঙ্গে কথাগুলি বলতে চাইলেও ওর শেষ দিককার কথায় গলার স্বরটা জড়িয়ে এলো।

ঠিক এই সময় গোপা লাল রঙের খামে আঁটা একখানি পত্র স্বামীর হাতে দিয়ে বললো, 'দেখত কার চিঠি? কোনও শুভ অনুষ্ঠানের বলে মনে হচ্ছে যেন—"

"হ্যাঁ গোপা এ চিঠি বিয়েরই—" অভ্র বললো—"কার বিয়ের জানো— শ্যামলের—"

'শ্যামলের?'

—হ্যাঁ, মনে হচ্ছে আমাদের পার্শেল ক্লার্ক ললিতবাবুর মেয়ে সতী;—বুঝেছ গোপা—' অভ্র স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে একটু অদ্ভুত ধরণের হাসি হেসে তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখটা ফিরিয়ে নিল। গোপা স্বামীর কথা বুঝতে পারলো কিনা তা সে নিজেই উপলব্ধি করতে না পেরে কয়েকটা মুহূর্ত বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ওর মাথার মধ্যে দপ করে যেন জ্বলন্ত এক আগুন শিখায়িত হয়ে উঠলো। সে স্তব্ধ

ক্ষমার পাশে এসে বসে তপ্তকণ্ঠে বলে উঠলো,—এ সব কী অন্যায় বলতো ঠাকুরঝি—ওরা যা ইচ্ছে তাই করবে’—না—না সে আমরা কিছুতেই মানবো না, এর প্রতিবিধান তোমাকে করতেই হবে,—বুঝতে পেরেছ ? কই কথার উত্তর দিচ্ছ না যে—’ ?

‘কী উত্তর দিব বল বৌদি ? কী বা প্রতিবিধান করবো’—নিষ্প্রভ কণ্ঠে ক্ষমা বললো, ‘আমি কী ভাবছি জানো, ওরা যে আমায় বৌ ক’রে কয়েকটা বছর বধূ হবার সুকৃতি আমায় দিয়েছিল, সেইটেই আমার পর্যাপ্ত ভাগ্যের পক্ষে যথেষ্ট নয় —’ ?

‘না—না—ওসব ভাব-প্রবণতার এটা যুগ নয় ঠাকুরঝী ‘রীতিমত দৃপ্ত ভাবে গোপা বলে উঠলো,—‘ভরণপোষণের দাবী তোমার করতেই হবে, জব্দ করতে হবে—প্রতিশোধ নিতে হবে—’

‘কিন্তু বৌদি ওদের জব্দ করতে আমরা কী পারবো ? প্রতিশোধ নিতে গিয়ে কী নিজেকেই প্রতিহত হতে হবে না ? যখন কাগজে কাগজে তাঁর নামটা ঘুরে বেড়াবে, তখন ‘কাদায় ঢিল ছুঁড়তে গিয়ে যে’—ক্ষমা আর বল্‌তে পারলো না, কান্নায় ওর গলার স্বর অবরুদ্ধ হয়ে এল। ঠিক একটি ছোটমেয়ের মত কোরেই ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। যেন কোথায় ওর ব্যাথার নির্ঝর উৎসারিত হয়ে উঠেছে, ও কিছুতেই তাকে প্রতিরোধ করতে পারছে না। ভীষণ বিব্রত হয়ে উঠলো গোপা ওর রুক্ষ মনে সহসা সুমিষ্ট সান্ত্বনার ভাষা ধরা দিল না বলে ও শুধু নীরবে নিজের আঁচল প্রান্তে তার অশ্রু-সজল চোখ দুটী মুছিয়ে দিতে লাগলো। কিন্তু সে বন্যার মত অন্তর প্লাবনের বাধা দেবার ওর সাধ্য কী ?

সঙ্গোপনে

আন্মনা অভ্র তখন গোধূলি-ম্লান পুকুরের জলের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল, সন্থ আসা আমন্ত্রণ লিপিখানা শিথিল মুঠিতে ধরা রয়েছে, ওর চিন্তার আলোড়নে হৃদয়, মন, মস্তিষ্ক সব বিপর্যস্ত। চোখের সুমুখে আসন্ন মৃত্যু সতীর একখানি বধূ-মূর্তি মূর্ত হয়ে উঠেছিল। ও ভাবলো, 'যাক্ আজকের ক্ষমার এই দুর্ভাগ্য-মুহূর্ত তবে সতীর জীবনে আর ঘনীভূত হয়ে উঠবার অবসর পাবে না: ওরি ভাগ্য প্রসন্ন, তাই ও নিশ্চিত মৃত্যুর শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে। এবার শ্যামলের বাপকে বধূর ব্যাধি নির্ণয় করতে মিথ্যার শরণাপন্ন হতে হবে না, সতী তার স্বামীর বিবাহের পথ নিজেই মুক্ত করে দেবে। হঠাৎ ক্ষমার অস্ফুট কান্নার করুণ কণ্ঠস্বরে অভ্রর চিন্তার তার যেন কেটে গেল, অনুজার মূর্তির দিকে তাকিয়ে স্ত্রীকে সে বললো, 'ওকে সান্ত্বনা দিও না, গোপা—কাঁদতে দাও—শুধু একটু কাঁদতে দাও।

"সন্ধান"

ত্রিশের কোঠা পেরিয়ে এসে সুনন্দা একদিন অনুভব করলেন, মনের মধ্যে তাঁর কয়েকটী গল্পের প্লট উৎপীড়ন সুরু করেছে, সাহিত্যিকা তাঁকে হতেই হবে। সুতরাং ? সুতরাং সুনন্দা স্থির করলেন, কিছু পড়াশুনা করে নিয়ে তারপর কলম ধরবেন। কারণ বাঙলা সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি একেবারেই অনভিজ্ঞা ছিলেন। এই তো সেদিন ধনী ব্যক্তির স্ত্রীর সম্মানে রবীন্দ্র শোক-সভার সভানেত্রীত্ব করতে যেয়ে রবীন্দ্রনাথের লেটেষ্ট 'নভেল কী বল্‌তে না পেরে ভারী অপ্রতিভ হয়ে ছিলেন।

যাক সে কথা।

সংসার জীবনে সত্যই তিনি সার্থক রমণী।

স্বামীর অজস্র পয়সা, মিঃ মৌলিক একজন সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, সৌখীন বাঙলো, সুন্দর, পুষ্পোদ্যান, লেডলর কাঁচের বাসন, পপিউলর ফার্ণিচারের আসবাবপত্র, হীরের গহনা, জর্জ্জেটের কাপড় জামা, চতুর্দিকে ঝলমলে ঐশ্বর্য্যেরই পরিচয়। অভাব শুধু দুটী—আসাম অঞ্চলের এক ছোট মফঃস্বলের পল্লীতে মিঃ মৌলিক পোষ্টেড, তাই গাড়ী গ্যারেজেই বন্ধ রাখতে হয় এবং একটি মাত্র ছেলেকে দেশীয় স্কুলেই লেখাপড়া শেখাতে হয়। বোর্ডিঙের অযত্নে তাঁদের বংশে কার যেন টি-বি হয়েছিল—, তাই ওই দিকটায় তাঁরা আতঙ্কের সঙ্গেই নির্লিপ্ত।

সঙ্গোপনে

সেদিন বিকেলবেলা মিঃ মৌলিক অফিস থেকে প্রত্যাবর্তন করলে, চায়ের টেবিলে সুনন্দা স্বামীকে বল্‌লেন—শুনছ আমি কিছু বই কিনবো আর খান কয়েক সাময়িক কাগজ রাখব ভাবছি—

ওঃ সেদিন বল্‌ছিলে একটা বুঝি গল্প লিখবে—উৎফুল্ল কণ্ঠে স্বামী বললেন তা—বেশতো—, সাহিত্য চর্চা করতে হলে শেলী, বায়রণ, টলষ্টয়, ম্যাক্সিম গোর্কি পড়তে হবে বৈ কি।

ওগো—না না আগে কিছু বাঙলা বই পড়বো স্বামীর কথার মধ্যেই স্ত্রী বলে উঠলেন।

বাঙলা বই—? তার আবার পড়বার কিছু আছে নাকি? কেবল পয়সা নষ্ট—।

মিঃ মৌলিকের খাওয়া হয়ে গেছলো, ফিঙ্গার বোলে হাত ধুয়ে তোয়ালেতে মুখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে বল্‌লেন—, তুমি ও দেশের সাহিত্যের ভালো বুকলিষ্ট করে রেখ—আমি আনিয়ে দেব। তিনি টেনিস র‍্যাকেটটা দোলাতে দোলাতে ক্লাবের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়লেন। ভীষণ নাকি তাঁর রাশ ভারী, তাঁর কথার কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস পায় না, স্ত্রী ছেলে কেউ নয়—, তাঁর জুতোর শব্দ মিলিয়ে গেলে সুনন্দার দুই চোখ বেয়ে অজস্র ধারে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো, তিনি মাথাটা টেবিলের উপর রাখলেন।

কিছুক্ষণ পর চটী জুতোর ফট্‌ফট্‌ শব্দে তিনি বুঝলেন খোকন আস্‌ছে, তিনি মাথাটা তুলে, আঁচলে সজল চোখ দুটী মুছে ফেলে স্বাভাবিক ভাবে সেদিনের ষ্টেটস্‌ম্যান কাগজখানার উপর দৃষ্টি বুলোতে লাগ্‌লেন। বারো বছরের ছেলে সানি ঘরে ঢুকতেই বল্‌লেন, "হাঁরে সানু এখানে বাঙলা বই কোথায় পাওয়া যায় জানিস—?

ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউটে পাওয়া যায়তো মা—, তবে আমরা ইউরোপিয়ান ইনষ্টিটিউটের মেম্বার কিনা—

সে তো জানি—সুনন্দা বলে উঠলেন, চাইলে আমরা বাংলা লাইব্রেরীর বই পেতে পাই না ?

নিয়ম যে নয় মা—বাবা অফিসার কিনা তাই আমাদের ইংরেজী লাইব্রেরীর সঙ্গেই কানেকসন রাখতে হবে—সানু এবার প্রচুর উৎসাহের কণ্ঠে বলে উঠল তবে জানো মা আমাদের থার্ড মাষ্টার মশাই কবি অর্ণব গাঙ্গুলীর বাড়ীতে দু' আলমারী বোঝাই বাঙলা বই আছে—, তুমি বলতো আমি চেয়ে এনে দেব ?

বাঙলা বই ? সত্যি সানু ? তোদের মাষ্টার বুঝি সাহিত্যিক—কিশোরী মেয়ের মত চঞ্চল কণ্ঠে মা বলে উঠলেন।

তিনি তো এখনকার উদীয়মান কবি সাহিত্যিক কী চমৎকার লেখেন যে, কত মাসিক পত্রিকায় ছাপা হয়, আমরা গেলেই কবিতাগুলো পড়ে শোনান্—

আমায় নিয়ে চল্‌না সানু তাঁর বাড়ী—, আমি তাঁর সঙ্গে আলাপ করবো, বাকী কথাগুলো সুনন্দা মনে মনে বল্‌লেন, সাহিত্যিক হতে গেলে সাহিত্যিকের সঙ্গে আলাপ না করলে চলে কখনও ? বিশ্বকবিকে দেখতে কত দূর দূরান্ত থেকে তো কত লোক আস্‌তেন, না না এ সুবর্ণ সুযোগ কিছুতেই নষ্ট করা চল্‌বে না—তিনিও যে একদিন বিশ্বকবির স্থান না অধিকার করবেন এ কথা কে বল্‌তে পারে ? কবি অর্ণব গাঙ্গুলির প্রতি তাঁর মন শ্রদ্ধায় আনত হয়ে এল।

সানু বল্‌লো—, কিন্তু মা বাবা যে অফিসার তিনি যে ইস্কুল মাষ্টার—

ছেলেকে থামিয়ে দিয়ে মা বল্‌লেন—, রেখে দে তোর অফিসার—, জানিস তুই রাজা মহারাজা ক্রোড়পতির চেয়েও সরস্বতীর সেবকের সম্মান অনেক উঁচুতে—, দারিদ্রে জর্জরিত যে তাকেই তো ভারতী টানেন—

সানুও তাই চায়—, সে তার মাষ্টার মশাইয়ের একজন বিশিষ্ট ভক্ত—জননীকে তার বাড়ী নিয়ে যেতে পারবে—এটা কী তার পক্ষে কম গৌরবের, খুশি হয়ে সে বল্‌লো—, তবে চলো মা—

*　　　*　　　*　　　*

স্থানীয় হাইস্কুলের থার্ডমাষ্টার কবি অর্ণব গাঙ্গুলির বাড়ীটা সানুদের বাঙলোর খানিকটে দূরে, বাড়ী বল্‌তে টিনের ছাদ দেওয়া একখানা ঘর, একটু বারান্দা, পায়খানা আর রান্নার ঘর। অবশ্য কবির রান্না ঘরের কোনই প্রয়োজন হয় না, সে ষ্টেশনের রেষ্টুরেণ্ট, হোটেল ইত্যাদিতেই আহারকার্য সমাপন করে। কোনও দিন না খেয়েও দিন চলে যায়, বয়স চব্বিশ, রক্তের গরমে ক্ষুধা তৃষ্ণা সম্ভবত সঙ্কুচিত হয়।

তার দুয়ার সান্নিধ্যে পৌছে সুনন্দা সানুকে জিজ্ঞেস করলো হাঁরে খোকন তোর মাষ্টারমশাইর স্ত্রীকে দেখেছিস? আমাকে তার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে লজ্জায় ঘোমটা টেনে পালিয়ে যাবেন না তো?

মাষ্টার মশাইর স্ত্রী? সানু যেন আকাশ থেকে খসে পড়লো, এমনি অবাকের ভঙ্গিতে বল্‌লো,—তিনি তো বিয়ে করেননি মা—খোকন দরজার কড়াটা নাড়তেই সুনন্দা বলে উঠলেন, আরে থাম্ দরজা নাড়িসনে, মেয়ে-ছেলে নেই বাড়ীতে, একা পুরুষ মানুষ—সত্যি কথা বল্‌তে কী সুনন্দার চোখে স্ত্রী ছেলে মেয়ে পরিবেষ্টিত অর্ণবের একখানি সংসারী চিত্রই পরিস্ফুট

হয়ে উঠেছিল। বাঙ্গালীর সংসারে চাকুরী পুরুষ যে অবিবাহিত থাকতে পারে এ ছিল তার ধারণার বাইরে। একা পুরুষ মানুষের সঙ্গে আলাপ—, তিনি একটু কুণ্ঠা অনুভব করলেন, কিন্তু সানুর দুয়ার নাড়ার শব্দে কবি তখন দরজা খুলে দিয়েছিল। এবং এ ভাবে এক ভদ্র মহিলাকে তার দরজায় দেখে রীতিমত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। সানু বললো—, স্যর ইনি আমার মা, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে নিয়ে এসেছি, আপনার লেখা পড়বেন। সুনন্দা একটী ছোট্ট নমস্কার করে বল্লেন, আমি মনে করেছিলুম এখানে আপনার স্ত্রী আছেন—

তাতে কী হয়েছে—কবি এবার বেশ সহজ হয়ে নিয়ে একটু স্মিত হেসে প্রত্যাভিবাদন করে বল্লেন, আপনি আমার বাড়ী এসেছেন। সত্যি কী সৌভাগ্যবান আমি. আসুন, ভিতরে বসুন, ভাগ্যে কবির নিজের একটা চেয়ার ছিল সেইটে সে সুনন্দার দিকে এগিয়ে দিল। সুনন্দা ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, একখানা চৌকীতে আগোছান হয়ে বিছানাপত্রগুলি পড়ে রয়েছে, কাগজপত্র ও বইর সমাবেশে টেবিলখানা স্তুপিকৃত; তবে ঘরের দুই কোণায় স্থাপিত দুইটী আলমারী বোঝাই ঝকঝকে বাঙলা ইংরেজী গ্রন্থগুলি কক্ষে একটা সত্যকার শ্রী এনে দিয়েছে। একপাশে একটী ছোট সুটকেশ গ্রামোফোন রয়েছে। মুগ্ধ কণ্ঠে সুনন্দা বলে উঠলেন, বাঃ আপনার বাড়ী কত বাঙলা বই, আমি কিন্তু সব পড়ে নিঃশেষ করবো।

খুসির কণ্ঠে কবি বল্লে, বেশতো পড়বেন, সানি বলছিল আপনি একটা গল্প লিখবেন, পড়াশুনা করলে অনেক সুবিধে হবে আপনার—

লজ্জিত হেসে সুনন্দা বল্‌লেন, সানু বুঝি আপনার কাছে আমাদের হাঁড়ীর গল্প করে—

ওইতো আমার এখানকার একমাত্র বন্ধু মিসেস্ মৌলিক।

তারপর সাধারণ গল্প, মামুলি সাহিত্য চর্চা, কবির লেখার সঙ্গে একান্ত অপরিচিত থেকেও তার লেখার যশোগানে সুনন্দার কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। আপনি কত সুন্দর লেখেন, কী যে চমৎকার লাগে আপনার লেখা পড়তে, ইত্যাদি তাঁর প্রশংসার মুখরতায়, কবির চিত্ত আত্মতৃপ্তিতে ভরে ওঠে।

চায়ের কোনওরূপ ব্যবস্থা না থাকায় কবি আর একদিন মিঃ মৌলিকসহ সুনন্দাকে নিমন্ত্রণ জানালো কিন্তু সুনন্দা স্বামার অনুমতি গ্রহণ না করে তাকে নিমন্ত্রণ করতে পারলেন না, খুশিমত খানকয়েক বাঙলা বই বেছে নিয়ে সেদিনের মত বিদায় গ্রহণ করলেন।

*   *   *   *

মন্দ নয়। বই পড়বার সাহায্য করে একজন সম্ভ্রান্ত মহিলাকে সাহিত্যিকা বানাতে কবি অর্ণবের বেশ লাগে। এর মধ্যে একটা কবিত্বের গৌরব জাগে, আত্মস্ফীত হয়ে ওঠে সে। কিন্তু মুস্কিল বাধলো এই নিয়ে সুনন্দা প্রত্যহ প্রায় চার পাঁচখানা বইর পাঠ শেষ করে ফেলেন, বদলাতে না হয় সানু, না হয় ভৃত্য আসে। শুধু তাই নয় টেলিগ্রাফের তারে যেন খবর ছড়িয়ে পড়লো হাইস্কুলের থার্ডমাষ্টারের ঘরে প্রচুর বই আছে। সংসারে এই ধরণেরই লোক বেশী দেখতে পাওয়া যায়—পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গেই তারা কাজ হাঁসিল করতে চায়। তাই

বই পড়ে যারা শুধু সময় কাটানোর জন্যই, তারা এ দিকটায় পয়সা খসাতে চায় না। সত্য কথা বলতে কী তাদের দৌরাত্ম্যেই কবি একেবারে উত্যক্তের চরমে উপনীত হয়েছিল। অথচ তাদের সে কতদিন বলেছে আপনাদের লিটারারী টেষ্ট যখন আছে, কিছু বাঙলা বই কিনুন না, এদেশের সাহিত্যিকগুলো বাঁচার মত বাঁচতে পারবে। তখনই প্রশ্ন ওঠে মেয়ের বিয়ে, ছেলের পড়া, বাপের দেনা, ভাইর চিকিৎসা ইত্যাদি; অর্ণব ভাবে অথচ এই অর্থ সমস্যায় স্ত্রীর গহনা, মেয়ের শাড়ী, নিজেদের বিলাস জীবন সেগুলি কখনও সঙ্কুচিত হয় না, শুধু বইর বেলাতেই যত দ্বন্দ্ব। সময় নেই, অসময় নেই, নিয়মিত ভাবে একই হারে মহড়া চলতে লাগলো, বইগুলো বদ্‌লে দিনতো স্যার, কিতাব দিজিয়ে বাবুজি, মশাই ভাল দেখে খানকতক বই দেবেন! এটা যেন তার লাইব্রেরী হয়েছে, কিন্তু সেই লাইব্রেরীয়ানগিরি করবার ওর অবসর কই? ছেলে ঠেঙ্গিয়ে যেটুকু সময় পায় তাইতে কাব্যচর্চা করে, তাতেও এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা। না না সে আর পারবে না—বিক্ষুব্ধ অর্ণব ভাবে পারবে না লাইব্রেরীয়ানগিরি করতে, স্পষ্টই সে প্রত্যেক আগন্তুককে জানিয়ে দেবে বই আর সে কাউকে দিতে পারবে না, এতে তার কাজের অপচয় হয়; না হয় আলমারীর কাঁচগুলো ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেবে, বইগুলো আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দেবে। কিন্তু কার্যকালে এগুলি কিছুই সম্ভব হয়ে ওঠে না—শুধুই দুঃখ পায় সে।

সত্যই দুঃখ পায় সে যথেষ্ট: পুরো দুই ঘণ্টার চিন্তার পর সবে কলমটা তুলেছে লিখবে বলে, না হয় পূর্ণোদ্যমে কলম চল্‌ছে, ঠিক সেই সময় জীবন্ত ভূতের মত লোকগুলো তার ঘরে এসে হানা দেবে যেন! একবার দুইবার

সহ্য হয়, কিন্তু বারবার ? অথচ এই কাব্য সাধনাকে ও পরিত্যাগ করতে পারে না, এই তার জীবনের অবলম্বন, প্রাণের চেয়েও প্রিয় মনের অষ্টাঙ্গী যোগে।

সেদিন ওর একটা চমৎকার কবিতার ভাব-মাধুর্য একজনের বইর তাগিদে মধ্য পথে নষ্ট হয়ে যেতে কাগজটা সে টুক্‌রো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিল এবং সানু এলে সে তাকে বেশ রুক্ষ ভাবেই বল্‌লো—সানু তোমার মাকে যে একদিন চা এর নিমন্ত্রণ করলুম, কই তিনি তো এলেন না, আমি না হয় যাবো তোমাদের বাড়ী তাঁকে জানাবো, আমি আর কাউকে বই পড়তে দিতে পারবো না, তিনি না নিলে অন্তরাও নেওয়া বন্ধ করবে।

সত্যি স্যর লোকগুলো সব সময় আপনাকে বড্ড জ্বালাতন করে—সানু বল্‌লো মা কী বলেন জানেন, আপনার বউ নেই বলে তিনি আস্‌তে পারেন না, বাবাকে রাজী করিয়ে একদিন আপনাকে নিয়ে যাবেন।

কিন্তু সে সৌভাগ্য আর কবির ভাগ্যে হয়ে ওঠে না, কারণ একজন স্কুল মাষ্টারের পাশে বসে অফিসার দম্পতির চা খাওয়া সাজে না—এই ছিল নাকি মিঃ মৌলিকের মত, তাই সুনন্দার সঙ্গে কবিরও সাক্ষাৎ সম্ভব হয় না। শেষ পর্যন্ত একদিন কবি বিরক্ত হয়ে ঠিক করে ফেল্‌লো, সে চাকরী ছেড়ে দেবে, এমন এক জায়গায় পালিয়ে যাবে, যেখানে ওর কাব্য সাধনা নিরবচ্ছিন্ন ও বাধামুক্ত হয়ে উঠতে পারবে।

সেদিন সে চাকরীতে রেজিক্‌নেসন দিয়ে একখানা দরখাস্ত লিখে ফেল্‌লো, মনে ওর অপরিসীম শান্তি, প্রাচুর্য খুশি, তারই মুখর অনুভূতিতে পরিপূর্ণ হয়ে দরখাস্তখানা পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে টেবিলে রেখে

দিয়ে, গ্রামোফোনে একখানি রেকর্ড লাগিয়ে দিল, "বন্দে মাতরম্, সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শস্য শ্যামলাং মাতরম্"।

সমস্ত পল্লীখানি বন্দিত করে গানখানি বেজে উঠলো। ঠিক সেই সময়ে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে দুয়ার খুলে দিতে দেখলো, সানুর সঙ্গে সাহেবী পোষাকে সজ্জিত এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। সানু বল্লো, বাবা আপনার সঙ্গে দুটো কথা বলতে এসেছেন স্যর। অর্ণব অফিসারের যথাযোগ্য সম্মানে তাঁকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো। গান তখন পুরোদ্যমে বাজছে, ভ্রুকুটী কুঞ্চিত করে মিঃ মৌলিক বললেন, মশাই নিজে হাতে আর খাল কেটে কুমীর আনেন কেন? যে দেশের অবস্থা এ সব গান না বাজালেই ভালো—রীতিমত শঙ্কিত হয়ে তিনি ঘরের দরজা জানালাগুলি বন্ধ করে দিলেন। অর্ণবের প্রতিবাদ করা স্বভাব নয়, প্রতিবাদ সে করে না; নিজস্ব মত নিজেই মেনে চলে খুশি থাকে, প্রচার করে না, জানে প্রচার করলেও স্কুল মাষ্টারের কথা কেউ মানবে না। তাই সে গান শেষ হয়ে গেলো, গ্রামোফোনটা বন্ধ করতে করতে অন্য কথা বল্লো, আপনি কত বড়লোক, আপনার সঙ্গে পরিচয় থাকা কত সৌভাগ্য, এইতো দেখুন না টি-বি ফাণ্ডে সাহায্য করতে আমরা একটা প্লে করবো, তা কেউ টিকিট করে দেখতে রাজী নয়, আপনি যদি আপনাদের ডিপার্টমেণ্টে একটু দয়া করে বলেন—বাধা দিয়ে মিঃ মৌলিক ঘরে পায়চারী করতে করতে বল্লেন, আরে রাখুন মশাই এখন টি-বি ফণ্ড, দেশের লোক আর কোত্থেকে দেবে বলুন, এইতো সেদিন তাদের নিঙড়ে নিঙড়ে চাঁদা তোলালুম war-fund এর জন্যে শ'তিনেক টাকা; তারপর কী ভাবছি জানেন, spit fire contribution এর জন্যে টিকিট করে

আমাদের ক্লাবে একটা প্লে করার ব্যবস্থা করবো, অন্ততঃ আমাদের শ দু'য়েক টাকা তুলতেই হবে—বল্‌তে বল্‌তে মিঃ মৌলিক একবার থেমে আবার বল্‌লেন, আমাদের প্লেয়ার বড় কম, আপনি যদি একটা পার্ট নেন তাহলে খুব ভালো হয় মাষ্টার মশাই, আগ্রহের চোখে তিনি অর্ণবের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কিন্তু অর্ণব এ কথার কী উত্তর দেবে? ওর কাণের পর্দায় তখন war-fund, T. B. fund, spit fire contribution, চাঁদা, প্লে প্রভৃতি শব্দগুলি বিচিত্র এক সুরে অনুরণ তুলেছিল, তাই সে অন্যদিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল। মিঃ মৌলিক কিন্তু তার এই নীরবতায় নিজেকে অপমানিত বোধ করলেন এবং বেশ রুক্ষ স্বরেই বল্‌লেন, আর শুনুন, আপনার কাছে যে জন্যে এসেছি, আপনি আর আমার স্ত্রীকে বাঙলা বইটইগুলো দেবেন না, আপনি এখনও এই সব বই কী করে যে কাছে রাখেন বুঝি না—খবরের কাগজে মলাট দেওয়া একখানা বই পকেট থেকে বের করে মিঃ মৌলিক অর্ণবের দিকে এগিয়ে দিলেন। অর্ণব কখনও বইতে খবরের কাগজে মলাট দেয় না, প্রথমটা সে বুঝতে পারে না এখানা তার কী বই, তারপর পৃষ্ঠা ওলটাতে যখন দেখলো, শরৎচন্দ্রের "পথের দাবী", তখন সে খবরের কাগজের মলাটের আড়ালে বইখানা রাখবার হেতু বুঝতে পেরে, নিজের মনে ফিক করে হেসে ফেলে কোচার প্রান্তে মুখটা মুছতে মুছতে বল্‌লো, এখানা তো শরৎচন্দ্রের ভালো বই—

আরে রেখে দিন মশাই কে শরৎচন্দ্র কে নৈমিত্তিক চন্দ্র সে সব আমি বুঝি না, এ সব বই বাড়ীতে রেখে আমার চাকরীটা খোয়াব নাকি, আপনাকে বলা রইলো, আপনি আমার স্ত্রীকে কোনও বই পড়তে দেবেন না,

আয় সান্ন বাড়ী চল তিনি অর্ণবের কোনও কথা শোনার প্রতীক্ষা না করে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। সান্নু একবার করুণ চোখে মাষ্টার মশাইর দিকে তাকিয়ে পিতাকে অনুসরণ করলো।

খানিকটা সময় কেটে গিয়েছে। অর্ণব ওর টেবিলের সামনের চেয়ারখানিতে বসে, মুক্তির সুর ওর অন্তরে অনুরণ তুলেছে. চোখে মুখে কৌতুকের প্রফুল্ল হাসি। যাক্ সে বেঁচেছে ও ভাবলো সুন্দর পথের সে সন্ধান পেয়েছে, পথের দাবীর মধ্যে মুক্তির সুর প্রচ্ছন্ন রয়েছে। আর ওর চাকরীতে রেজিগনেশন দিতে হবে না, নিরবচ্ছিন্ন চিন্তায় সে কাব্য সাধনা করবে, যে বই পড়তে চাইবে এগিয়ে দেবে পথের দাবী, চাকরীর অজস্র মমতাই এবং একটা আতঙ্কের আবর্ত্তে তাদের বই পড়বার নেশা উঠে যাবে মন থেকে। একটু স্মিত হাসি হেসে অর্ণব চাকরীর রেজিগনেশনের দরখাস্তখানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে পেপার বাস্কেটে ফেলে দিল।

ফল্গু

নিতান্ত তুচ্ছ কথার সংঘর্ষে পাচক ঠাকুরটী যখন কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেল, অমিতা তখন একান্ত অসহায়ের দৃষ্টিতে সংসারটাকে দেখলো ভীষণ অন্ধকারময়। মুহূর্তে ওর চোখে জ্যোৎস্না ঝলমলে পূর্ণিমা রাত যেন ঘন কালোরূপে মূর্ত হয়ে উঠলো। পাঁচটা অনেক্ষণ বেজে গিয়েছে, স্তিমিত শিখায় ধীরে ধীরে দিনের আলো শান্ত হয়ে আসছে, স্বামী সাব-ইঞ্জিনিয়ার তাকে আনতে গাড়ী চলে গিয়েছে। অথচ চুল্লিতে এখনও অগ্নি-সংযোগ হয়নি, সে কিসের প্লেট ক্ষুধার্ত স্বামীর সুমুখে তুলে ধরবে? ইস্, চাকর বাকরগুলো মানুষকে কী ভীষণ পঙ্গু করে দিতে পারে, আবার তারাই ঝোপ বুঝে কোপ মারে। সবে মাত্র অমিতা তখন বিকেলের বেশ প্রসাধন সঙ্গে করে নিজের ঘরের দক্ষিণ দিকের খোলা জানালার সুমুখে বসে অর্গ্যানের বুকে নূতন এক সুরের মধুর লহর তুলেছিল। স্তব্ধ ভাবে তার ফর্সা ঋজু অঙ্গুলিগুলি সাদা ধবধবে রীডের উপর দাঁড়ালো। বাধ্য হয়ে সে নীচে নেমে এল, ফুল স্লীভের ভয়ালেটের ব্লাউসটা কুনুইর উপর তুলে, কয়লা গুদাম থেকে কয়লা ভেঙ্গে এনে উনুনে অগ্নি-সংযোগে মন দিল।

"একী অমু তুই যে উনুনে আঁচ দিচ্ছিস, রাম কিষণ গেল কোথায়"?

ঠিক সেই সময় একটী আঠার উনিশ বছরের তরুণী মেয়ে এসে রান্নাঘরের সুমুখের বারান্দায় উঠলো।

মেয়েটী অমিতার একজন অন্তরের অন্তরঙ্গ সখী, নাম লাবণ্য—, কোলকাতায় কোনও এক মেয়ে স্কুলে পড়ায়, থাকে বোর্ডিংএ, ছুটীর দুটীদিন শনি ও রবিবারে বাড়ীতেই অতিবাহিত করে। অমিতাদের সরকারী বাঙলোর সংলগ্নে ওদের বাড়ী। রান্নাঘরের ভিতরটা তখন জমাট বাঁধা ধোঁওয়ায় ভরে গেছলো, পাকানো পাকানো তার কালো কুণ্ডুলিগুলকে দুই হাতে সরাতে সরাতে বাইরে বেরিয়ে এসে অমিতা বল্লো, "আর বলিস্‌নে লাবু, ওদের অহঙ্কারের কথা, কী ভীষণ উত্তর করে মুখে মুখে বের করে দিয়েছি—" জলে টলমল্ লাল চোখদুটী সে অঞ্চলপ্রান্তে মুছে ফেল্লো। ওর কয়লামাখা সাদা হাতের কালো রঙের দিকে তাকিয়ে ভ্রূদুটী ঈষৎ কুঞ্চিত করে লাবণ্য বললো—, "ওরা জানে কিনা ওদের না হলে আমাদের চলেনা, তাই ওরা ধরাকে সরা দেখে না—"

কলের কাছে গিয়ে হাত ধুতে ধুতে অমিতা বল্লো—, "অথচ তুই গ্রাজুয়েট ক্লার্ক চা—একটা চাইলে দশটা পাবি—"

"সেই কথাই বল্‌ছিল আমাদের নিটিং টিচার মিসেস মৈত্র—" লাবণ্য বল্লো "বাস্তবিক ভারী কষ্ট তার, এম-এ পাশ করেও স্বামী বেকার—ভজলু কোথায় গেল বল্‌তো, সে তো আঁচটা দিয়ে দিতে পারতো—, তোর ও সাদা জামা বদ্‌লে ফেল্‌তে হবে—, কয়লা মেখে একাকার হয়েছে"। স্বামীর খাবার জোগাড় করতে করতে অমিতা বল্লো—, "সে গেছে ভাই ঠাকুর আন্‌তে—, বল্লো ছটার সময় কোন্ গাড়ী পশ্চিম থেকে আসে, তা'তে নাকী বহু কর্মপ্রার্থী যাত্রী আসে—, ও ছুটে গেল কাকে

যেন ধরে আনতে—" লাবণ্য জুতোটা খুলে ফেলে বন্ধুণীকে সাহায্য করতে, ময়দায় ময়ান দিয়ে জল ঢাল্‌লো মাখবে বলে।

*   *   *   *

বাস্তবিক, ভজলু পুষ্পেন্দুদের বহু পুরাতন দরদী ভৃত্য ; নিজের গ্রামের মায়া কাটিয়ে সুদূরের এই বিদেশে মনিব-পুত্রের কর্মস্থানে সে এসেছে, সংসারের প্রতি মায়া মমতা ওর অসীম। বাঙ্গলোর নিকটেই ষ্টেশন। ও তখন তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে একান্ত উৎসুকচিত্তে একখানি বেঞ্চে বসেছিল। কোলে তার ছিল অমিতার দুই বৎসরের শিশুপুত্রটী। জংশন ষ্টেশন। ট্রেনগুলি ঘন ঘন আসে যায়, ওদের পায়ের বিরাট ধ্বনি ষ্টেশনের কোন্ সুদূর প্রান্ত চকিত ও কম্পিত করে তোলে। অজস্র কণ্ঠের কলরবে, কর্মচঞ্চল দ্রুত পায়ের শব্দে প্ল্যাটফর্ম মুখরিত হয়ে ওঠে। ভজলুর অন্বেষণে দৃষ্টি, যাত্রীদের ভীড়ে আশাচঞ্চল হয়। বিরাট দৈত্যের মত যাত্রীপূর্ণ একখানা ট্রেণ প্ল্যাটফর্মের ভিতর প্রবেশ করলো। থার্ড ক্লাস কামরা থেকে একটী তরুণ যুবক নাম্‌লো, এগিয়ে এল ভজলুর নিকটে, স্নিগ্ধ চোখে অমিতার শিশুটীর ফোটা পদ্মের মত হাসি বিকশিত মুখের পানে চেয়ে, তার গৌর কপোলে আদরের দুটী টোকা মেরে বল্‌লো, "কি গো খোকন, আমায় দেখে এত হাসি কেন ?"

"ওই রকম ওর ধরণ বাবু—বাড়ীতে কেঁদে কেঁদে মাকে পাগল করবে, আর বাইরের লোক ডেকে ডেকে আলাপ করবে—" ভজলু খোকাকে একটী চুমু খেয়ে দৃষ্টি মেলে যুবকটীর পানে তাকিয়ে দেখ্‌লো। ওর মনে হোল যুবকটী যেন ভদ্রবংশের ছেলে,— তবে চেহারা তার সুকুমার হলেও,

অত্যন্ত শ্রীহীন; গৌর রং দরিদ্রের আবরণে ম্লান। শীর্ণ ললাটে রুক্ষ চুলগুলি অবিন্যস্ত হয়ে ছড়ানো রয়েছে। এককথায় দীনতার মূর্তিমান রূপ যেন ও। পরণে অত্যন্ত ময়লা একখানা ধুতি, গায়ে অর্ধছিন্ন হাতকাটা সার্ট, হাতে একটা চটাওঠা টিনের সুটকেশ ও সতরঞ্চিতে জড়ানো বিছানা। ওর সার্টের ছিন্ন প্রান্তে উপবীতগুচ্ছের আভাষ পেয়ে সহসা ভজলুর নিরাশা আকুল মনটা আশার স্তিমিত প্রদীপে ঈষৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আচম্‌কা ভাবে সে যুবকটীকে প্রশ্ন করলো, "কোথায় যাচ্ছ বাবু তুমি?"

"এইতো দুটী ষ্টেশন পর ইছাপুর—"

"কেন বাবু"?

"চাকরীর চেষ্টায়—"

"চাকরী—? আমাদের বাড়ী চাকরী করবে বাবু"?

"করবো" তৃষ্ণার্ত পান্থ যেন শুষ্ক তালুতে পেলো এক ফোঁটা জল—" এমনই ব্যগ্রতা যুবকটীর আগ্রহ মাখানো কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হয়ে উঠলো। কিন্তু পরমুহূর্তেই ওর সে ঔৎসুক্য নিভে গেল, মুখখানা ঘন ম্লানিমায় নিবিড় হয়ে উঠলো, যখন সে শুন্‌লো ওকে রাঁধতে হবে।

রাঁধুনী বামুন? পাচকবৃত্তি? শেষে ওকে প্রাণের সম্পদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অমূল্য ডিগ্রীগুলি পাচকবৃত্তির পায়ে বিসর্জন দিতে হবে? একটুকরো ক্ষীণ হাসি ওর ওষ্ঠে ঝল্‌সে উঠলো। দু'মুহূর্ত নীরবে ও যেন কী ভাব্‌লো, হঠাৎ ওর চোখের অভ্যন্তর কি যেন একটা সুখের ছায়া-সম্পাতে ঝল্‌মল্‌ করে উঠলো। দৃষ্টির সুমুখে ফুটে উঠলো অপরূপ সুন্দর রস-সুমিষ্ট মধুর কৌতুকপূর্ণ রঙ্গিন ছবি— ; "মন্দ কী"? মনের নিভৃত দেশে

ওর ধ্বনিত হোল, "না-হয় ভুদিন পাচকবৃত্তির মাঝেই একটানা জীবনটা বিচিত্র সুন্দর অনুভূতিতে ভরে উঠবে। রোমান্স—, হ্যাঁ নিতান্ত অভাবিতে রোমান্সের রঙ্গিন রাগে যদি কণ্টকময় যাত্রাপথ ক্ষণকালের জন্যেও স্বপ্নময়, ফুলময় হয়ে ওঠে তো উঠুক না কেন! সে তো আর সত্যকার প্রেম নয়, প্রেমের নিছক অভিনয়"।

মাধবী,—সে নিরন্তর আমারই। মুহূর্তের জন্য তার হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে বধূ মাধবীর অমল স্নিগ্ধ মুখটা জ্বলে উঠে, আবার নিভে গেল, দৃষ্টিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, প্রভাতবাবুর আমার উপন্যাসের তরুণী প্রিয়ম্বদার মাধুরীমন্দিত সুন্দর ছবিখানি। "প্রিয়ম্বদা—প্রিয়ম্বদা" ওর কণ্ঠে সুখের লহর তুলে, অতি অস্ফুটে মৃদু গুঞ্জনে বেজে উঠলো!

"বাবু কাজ করবেন—, আমাদের বাড়ী? দশ টাকা মাইনে খোরাক-পোষাক—"

ভজলুর কণ্ঠে যুবকটী চম্‌কে উঠলো, যেন সদ্য স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় বল্‌লো, "চলো"।

বাড়ী পৌঁছে ভজলু নীচে মাঠে দাঁড়িয়ে ডাক্‌লো, "বৌমা লোক এনেছি গো—দেখে শুনে নাও এসে—বাবু তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ভেতরে এস—" ভজলু গেটের বাইরে যুবকটীর উদ্দেশ্যে বললো। তখন দ্বিতলে আলাপনকক্ষে অমিতাদের গল্পের উৎস নিবিড়রূপে জমেছিল। কিছুক্ষণ হোল অমিতার স্বামী পুষ্পেন্দু অফিস থেকে ফিরে জলযোগান্তে ক্লান্ত দেহটী অলস ভাবে ইজি চেয়ারে মেলে দিয়ে চুরুট টান্‌ছিল। অমিতা ও লাবণ্যর হাস্য পরিহাসের তরল উচ্ছ্বাস ওর সব শ্রান্তি মুছে দিচ্ছিল।

"ওগো চলোনা গো ভজলু ঠাকুর এনেছে ঠিক করবে"—অমিতা স্বামীকে বল্‌লো।

"তোমাদের কাজকর্ম তুমি যাও বুঝে সুঝে নাওগো—" পুষ্পেন্দু স্ত্রীকে বল্‌লো।

মুহূর্তে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এসে অমিতা জিজ্ঞেস করলে ভজলুকে, —"এই ঠাকুর? কাজ করতে পারবে তো?

"হ্যাঁ বউমা"

"হ্যাঁ বউমা—" ঔৎসুক্য না চাপ্‌তে পেরে যুবকটী নত চোখ দুটী তুলে বারেক তাকালো অমিতার মুখের দিকে। সহসা যেন দমকা বাতাসে ঘরের প্রদীপ নিভে গেল। এ যে এক তরুণী গৃহিণী—; ওর কল্পলোকের মানসী প্রতিমা এক লীলাচঞ্চল হাস্যময়ী তন্বী মেয়ের পরিবর্তে অবগুন্ঠিতা, সিন্দুর-শোভিতা, শঙ্খবলয় পরিহিতা অমিতার কল্যাণী বধূ মূর্তিখানি ওর প্রসন্নমুখে দিল মেঘ ছেয়ে। চাপা নিশ্বাসে বুকের তল ভারী হয়ে উঠলো।

"তোমার নাম কী—"? অমিতার প্রশ্নে ও চমকে উঠলো, কয়েক-মুহূর্ত যেন কী ভাব্‌লো, ঈষৎ কুন্ঠিত ভাবে বল্‌লো, "শ্রীঅমলেশ অধিকারী"

"বাড়ী কোথায়"?

"কাল্‌না"

কাজকর্ম করতে পারবে তো—?

"আজ্ঞে হ্যাঁ"

"তবে ভজলু তুমি একে ঘর দোর দেখিয়ে দাও" অমিতা পুনরায় দ্বিতলে এল, লাবণ্য তখন বারান্দায় রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। অমিতা ওর পাশে দাঁড়িয়ে বল্‌লো, "দেখ্‌লি তো চেহারা, ভদ্রবংশের

ছেলে, মনে হয় লেখাপড়াও নিশ্চয় জানে—কাজকর্ম করতে পারবে তো" ?

"না পেরেই বা উপায় কী বল" ? মৃদু হেসে লাবণ্য বল্‌লো, "ওর ওই ললিত চেহারা, শিক্ষার গৌরব, বংশ আভিজাত জীবনের সার্থকতার পথ তো বলে দিতে পারবে না, ওর দারিদ্র ওর সব চুষে নেবে, দুমুঠো ভাতের জন্য ওর সব কিছুই বিসর্জন দিতে হবে—; সেই কথা আমাদের মিসেস মৈত্রও বলে। বাস্তবিক কী যে কষ্ট তার—বাড়ীতে বাচ্চা বাচ্চা দুটী মেয়ে আছে—, সে কী আর সাধ করে টিচারী করতে এসেছে ? উপায় কী ? স্বামীর তার যথেষ্ট শিক্ষার গৌরব থেকেও সে বেকার। রোজ সে মেয়েটীর জন্য দুফোঁটা চোখের জল ফেলবেই। বাড়ী আসানসোলে, সে এক গ্রামের ভেতরে, প্রতি হপ্তায় যেতেও পারে না. মেয়ে দুটীকে অতদূরে রেখে মন কী চায় বোর্ডিংে থাকতে—"

ওরা একান্ত সহানুভূতিরচিত্তে নূতন পাচক ঠাকুরের সমালোচনায় নিবিড় হয়ে উঠলো।

নিরুৎসাহী অমলেশ তখন আপন প্রাপ্য কক্ষে ভীষণ অস্বোয়াস্তির অনুভূতিতে ভরে উঠেছিল। সে যাবে এখন কোন্ পথে ? ওর দুরন্ত আশাতরুটী নির্মূল হোল, রোমান্সেরও ভরসা নেই—তবে কী নিতান্তই শুষ্ক ভাবে রন্ধনবৃত্তির পায়ে জলাঞ্জলি দেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অমূল্য ডিগ্রীগুলি ? কিন্তু ওর মর্মবীণায় তখনও অমিতার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ভারী মধুর সুরে অনুরণিত হচ্ছিল, ওই সুরের লহর যেন কিসের এক প্রেরণা আন্‌লো তার মনে।

* * * *

অমিতার সংসারের ধারা যেন তার যাদু, হাতেই বদ্‌লে দিল অমলেশ। সাধারণ মাইনে করা পাচক ঠাকুরের মত তার কাজকর্ম নয়। সমস্ত খুঁটি-নাটী টুকরো কাজগুলিও সে নিজে হাতে সুবিন্যস্তে গুছিয়ে করে। ওর হাত দুটী যেন মেল ট্রেণ, মুগ্ধ হয়ে অমিতা ও যখন উনুনে আঁচ দেয়, মাছ কোটে, বাটনা বাটে, তখন কর্মচঞ্চল দুটী হাতের পানে একান্ত বিস্ময় ও ব্যথিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, হয়তো ওর চিত্তের গহীনতম বেদনার সমুদ্র উদ্বেল হয়ে ওঠে, নিশ্বাস পড়েও একটা—"আহা ভদ্রবংশের ছেলে, শেষে কীনা—" ওর তার অজ্ঞাতে ওর করুণ দৃষ্টি অমলেশের মুখে মেলে রাখে। অমলেশ সন্ত্রস্ত হয়, অমিতার অচঞ্চল চোখে ওর দৃষ্টি মিশ্‌লে সে ত্রাস্তে নত করে তার বিব্রত চোখ দুটী। কিন্তু বড় ভালো লাগে অমিতার ওই পলকহারা দৃষ্টি তার। সে আবার চোখ তুলে চায়, বিবেক ওকে বাধা দেয়—, "ছিঃ একী তোমার প্রবৃত্তি? অমিতা না বিবাহিতা নারী? সে মাধবীর মুখটা বুকে ফুটিয়ে তুল্‌তে চায়—, মনকে সংযত করতে চেষ্টা করে, কিন্তু অবাধ্য মন শোনে কই ওর মানা? মানে কই ওর শাসনের বাঁধ? তার খেয়ালী জোয়ারের কাছে অমলেশের সকুল চেষ্টা পরাস্ত হয়।

দিন চলে, তারই সঙ্গে ওর চিত্তের ঔৎসুক্য আরও নিবিড় হয়, অমিতার দৃষ্টি তাকে আর পারে না তৃপ্ত করতে, তার কাছে আরও কিসের প্রত্যাশায় যেন সে লুব্ধ ও চঞ্চল হয়ে ওঠে। কত সময় একান্ত আত্মবিভ্রম হয়ে যায় সে। ওর এই ভাবখানা লক্ষ্য করে লাবণ্য একদিন বল্‌লে, বন্ধুনীকে, "নূতন ঠাকুরের স্বভাবটা দেখেছিস্—কী রকম যেন বিশ্রী, তুই ওর সঙ্গে বেশী মিশিসনে মাথায় চড়ে বস্‌বে"।

মৃদু হেসে অমিতা বল্‌লে, "অত ভয় তুই করিস্‌নে লাবু, কথা দুটো

বলতে হয়, যদি ব্যথার জায়গায় ঘা খায় বুঝলিনে, শিক্ষা ও বংশের তো একটা মর্যাদা আছে—"

"কিন্তু সে যদি তোর ওই সম্ভ্রমটাকে উপযুক্ত ভাবে গ্রহণ করতে না পারে—" লাবণ্য হয়তো বা তার সূক্ষ্ম দৃষ্টির ঝক্‌ঝকে ছুরীর আলোয় অমলেশের মনের কোনও গোপন ছবি অনুভব করেছিল, তাই সে বন্ধুনীকে চকিত করতে সন্ত্রস্ত হয়েছিল। ও আরও যেন কী বলতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় অমলেশ ঘরে ঢুক্‌লো। বললো, "দাদাবাবুর কাট্‌লেটগুলো কী আমি ভাজ্‌বো" ?

অমিতা চোখ তুলে দৃষ্টি মেলে ওর দিকে তাকালো, দেখ্‌লো, কি সহজ, সরলতায় স্নিগ্ধ ওর হাস্যোজ্জ্বল কমনীয় মুখটা—, ওর মনে হোল লাবণ্যর মনটা বড় খুঁতখুঁতে সন্দিগ্ধ—। ও কিছুতেই তার যুক্তিগুলি সমর্থন করতে পারলো না, উঠে দাঁড়িয়ে বললো, "তুই বোস্ ভাই আমি কাট্‌লেটগুলো ভেজে এখুনি আস্‌ছি"।

অমিতা রান্নাঘরে গিয়ে দেখ্‌লো, অমলেশ চিংড়িগুলি পরিপাটীরূপে গড়ে-পিঠে ঠিক ভাজ্‌বার আগের মুহূর্তের মত করে থরে থরে একখানি প্লেটে সাজিয়ে রেখেছে। দেখে ওর বেশ আনন্দ হয়। সংসার অনভিজ্ঞ একজন পুরুষ মানুষকে খুঁটিনাটি কাজগুলি এরূপ নিখুঁতভাবে করতে দেখে ও একান্ত বিমুগ্ধ ও বিস্মিত হয়, সহানুভূতির আর্দ্রতায় অন্তর ভরে ওঠে। একদিন সে স্নেহের কণ্ঠে অমলেশকে জিজ্ঞেস করলে, "আচ্ছা অমল তুমি পুরুষ হয়ে মেয়েদের মত এমন সুচারু কাজকর্ম কেমন করে শিখ্‌লে বলত" ?

"শিখলুম আর কবেই বা—" অমলেশ বল্‌তে চায়, "কি জানি কিসের টানে যেন কাজগুলো আপনি হাতে এসে ধরা দেয়—" কিন্তু তা সে বল্‌তে

পারলো না, অনেক কষ্টে উচ্ছ্বসিত ঠোঁটের প্রান্তকে আয়ত্তে রেখে ধীর সংযত কণ্ঠে বল্‌লো, "মাঝে মাঝে ষ্টুডেণ্ট লাইফে করতুম কীনা —"

ষ্টুডেণ্ট লাইফ—, কথাটা ভীষণ ভাবে নাড়া দেয় অমিতার মনে, ওর মনটা ব্যথায় ভরে ওঠে, অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে আজ ওকে পাচকবৃত্তি করতে হচ্ছে। অমিতা মনের ও ভাবটা প্রকাশ না করে অত্যন্ত সহজ ভাবে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কতদূর পড়েছ অমল" ?

অমলেশ এবার আর তার নাম ধামের মত সত্য পরিচয় গোপন করলো না, কেননা সে জানে শিক্ষিতা মেয়েরা, শিক্ষিত ছেলেই পছন্দ করে। সে মুখটা নীচু করে বল্‌লো, "এম-এ পর্যন্ত পড়েছি।"

"আহা" অমিতার কণ্ঠ থেকে তার অজান্তে নিঃসৃত হয় অতি মৃদুভাবে, সে বলে অনেকটা ওকে যেন সান্ত্বনা দিতেই—, "আমার কিন্তু বেশ লাগে সব কাজে এক্সপার্ট ছেলেদের—"

এ কথার অমলেশ কিছু উত্তর দেয় না, একটু গর্বের হাসি হাসে, মন ওর অপরিসীম ফুল্লতায় ভরে ওঠে। এমনি টুক্‌রো টুকরো সুখের ভিতরও ক্রমশঃ মত্ত হয়, অমিতার সুমিষ্ট ব্যবহার ওর অন্তরে গভীর রেখাপাত করে। মাঝে মাঝে জ্যোৎস্না রাতের অস্পষ্ট তারার মত মাধবীর ভোরের আলোর মত নির্মল মুখটা অন্তরে ফুটে ওঠে। ওকে কাছে পাওয়ার একটা ব্যাকুলতা ওকে অদম্য করে তোলে, কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য, পরক্ষণেই সে আবার আত্মবিভ্রম হয়, অমিতার মিষ্ট সান্নিধ্যের নূতন মাদকতায়, ও পরিপূর্ণরূপে জমে ওঠে। মাধবীর মুখ মন থেকে উবে যায় কর্পূরের মতই। এমনি ভাবে ও চলে ওর স্বপন সায়রে রঙ্গিণ পাল তুলে দিয়ে, সবুজ পাখা মেলে দিয়ে আমেজ মাখানো মনে ও যেন বিচরণ করে ওর মধুর আকাশে। কালের

গতি ওর উৎসাহ, উদ্দীপনাকে অদম্য করে, নিবিড় করে এগিয়ে চলে। প্রত্যেকটা কাজ-কর্ম সে আরও সুন্দর করে, নিপুণ করে গুছিয়ে করে। অমিতার অনুরোধ সত্ত্বেও তাকে কোনও কাজের সংস্পর্শে আস্‌তে দেয় না। শুধু দেয় করতে তাকে তদারক।

লাবণ্য বল্‌লো একদিন অমিতাকে, "এ তদারকটুকু তোকে কেন কর্‌তে দেয় জানিস্, তোর এটুকু মিষ্ট সান্নিধ্য হতে নিজেকে বঞ্চিত করতে পারে না বলে—"

"তার মানে" ? অমিতা আশ্চর্যের চোখে বন্ধুনীর দিকে তাকায়।

"মানে, ও তোকে ভালোবাসে—"

"আমায় ভালোবাসে" তরল স্নিগ্ধ হাস্যে ও স্থানটা মুখরিত করে অমিতা বল্‌লো, "আসলে তোরা যে মেয়েরা বিয়ে করিস্ না, তারা সব পুরুষের চোখেই দেখ্‌তে পাস প্রেমের আলো—, বল্‌না লাবু সত্যি করে তোর ওকে ভালো লাগে নয় ? বেশ চমৎকার ছেলেটা কিন্তু বিয়ে কর্‌না ওকে—, আই-এর সঙ্গে এম-এ নিতান্ত বেমানান হবে না—"

"বিয়ে" খুব জোরে খানিকটে হেসে লাবণ্য বল্‌লো, "ও তোকে ভালো-বাসে, আমায় বিয়ে করবে কেন ? ওর দৃষ্টির পার্থক্য তুই একথাটুকু উপলব্ধি করতে পারিস্‌নে" ?

"দৃষ্টির পার্থক্য" এই কথাটা অমিতার মনকে সজোরে এক নাড়া দিল, ও চম্‌কে উঠলো, স্পষ্ট অনুভব কর্‌লো, লাবণ্যর কণ্ঠস্বর হাল্কা রহস্যপূর্ণ নয়, গভীর একটা সুর বাজে। ক্ষুমুহূর্ত সে স্তব্ধ হয়ে লাবণ্যর কথাগুলি ভাবে, এতদিন তার যে যুক্তিগুলি ও সমর্থন করতে পারেনি, প্রেম উন্মুখিত তরুণ মনের উদ্ভট কল্পনা বলে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল, আজ তা ওর মনে দিল গভীর

দাগ। কেননা কয়েকদিন আগে ও অমলেশের আচরণে এমন আভাষ পেয়েছিল, যা, ওকে আজ চকিত করে তুল্‌লো। সেদিন অমলেশ ওকে স্পষ্ট বলেছিল, "তার নাকি একটা ভালো চাকরীর সন্ধান জুটেছিল, কিন্তু তা সে গ্রহণ করতে পারেনি, কারণ কি যেন মায়ার জালে সে এ বাড়ীতে দিনের পর দিন জড়িয়ে পড়ছে।

অমিতা জিজ্ঞেস করেছিল "কিসের মায়া" ?

এর উত্তর অমলেশ ঠোঁটে দেয়নি—, দিয়েছিল চোখে, প্রেমের কারবারে যারা পরিচিত তারাই জানে সে দৃষ্টির ইঙ্গিত। সেইদিন সেই দৃষ্টে অমিতার উদার মনটা কেঁপে উঠেছিল, আজ তা রীতিমত জাগ্রত হয়ে উঠলো। ওকে নীরব দেখে লাবণ্য বল্‌লো—, "এটুকু তুই বুঝতে পারলিনে—. রন্ধনকার্যে ও এমন কী আর্ট পেয়েছে—, যার মধ্যে ও দিনের পর দিন মত্ত হয় উঠতে পারে ? নারীর সুরভিত চুলের গন্ধ মধুর অনুভূতির চেয়ে পুরুষের মদির প্রাণে আর কিছু বড় আর্ট আছে বলে আমার তো মনে হয় না তাই নয় কী" ? লাবণ্যর আচম্‌কা কণ্ঠস্বরে অমিতার চিন্তাতন্ত্রী ছিন্ন হোল, সে অবাক হয়ে এই চতুর মেয়েটীর উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। কি সূক্ষ্ম, গভীরতা পূর্ণ—, তীক্ষ্ণ ছুরীর মত ঝক্‌ঝক্ করে ওর দৃষ্টি। ওই চোখের সাহায্যেই তো সে অমলেশের নিভৃত অন্তরের গোপনতত্ত্বের সন্ধান আবিষ্কার করেছিল। ঈষৎ কুণ্ঠার কণ্ঠে ও বল্‌লো, "কিন্তু আমি যে স্বামীর স্ত্রী, সন্তানের জননী এ কথা কি সে ভুলে গেছে" ?

"ভুল্‌বে কেন ভাই—" লাবণ্য বল্‌লে, "ওর তারুণ্যের জোয়ার উচ্ছ্বসিতচিত্তে সেটুকু চিন্তা করবার অবসর কই—; কে বা সন্তানের

জননী, আর কেবা স্বামীর পত্নী? একটা দুর্জয় আকাঙ্খাতে যে ওর মনের নিভৃত কন্দর দুর্নিবার হয়ে উঠেছে। কয়েক মুহূর্ত থেমে লাবণ্য বল্‌লো, "সেই কথাই বলে আমাদের মিসেস মৈত্র, পুরুষের তারুণ্যের ওই উচ্ছ্বাসটাকে কখনও বিশ্বাস করতে নেই—, ওটা ভালোবাসা নয়, নিছক একটা মোহের মাদকতা। একদিন যেমন অস্বাভাবিক ভাবে জলেও ওঠে, নিভে যায়ও তেমনি আকস্মিক। একদিন সে নাকি তার সব বান্ধবীদের মধ্যে সব চেয়ে স্বামী প্রেমে গর্বিতা ছিল, আর আজ তার স্বামী তাকে একখানা চিঠি লিখেও খোঁজ করেনা। বিদেশে চাকরীর খোঁজে কে আর না গিয়ে থাকে" ?

"দিদিমণি কোলকাতার বোর্ডিং থেকে দারোয়ান একখানা চিঠি এনেছে" লাবণ্যর দাসী ঘরে ঢুকে তার হাতে একখানা চিঠি দিল। চিঠিখানা লিখেছিল, মিসেস মৈত্র—, ও ত্রস্ত হাতে কভারটা খুলে ফেলে পড়লো—

ভাই লাবণ্য—

"কাল বিকেল থেকে আমার অব্যার হার্টের কষ্টটা সুরু হয়েছে, বিছানা থেকে এই কয়ঘণ্টা হোল আর উঠতে পারছিনা। বলা যায়না তো—, মারাও তো পড়তে পারি, তুই যত শীঘ্র পারিস একবার আসিস—, আমার মেয়ে দুটীর সম্বন্ধে গোটাকতক কথা ব'লবো"

চিঠিখানা লাবণ্য অমিতার হাতে দিয়ে দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, তিনটের লোক্যাল ট্রেণ ও ধরবে।

* * * *

লাবণ্যার জুতোর শব্দ মিলিয়ে গেলে, অমলেশ অমিতার কক্ষে প্রবেশ করলো, হাতে ওর খোকার দুধের বাটি। "দিন খোকাকে দুধটা খাইয়ে দি—" সে অমিতার কোল থেকে খোকাকে দিল। ওর হাতে অমিতার হাতটা স্পর্শ করলো, সে যেন শিউরে উঠলো। অথচ এ স্পর্শ সংসারের কত খুঁটিনাটী কাজে কতবার হয়েছে, কিন্তু অমিতা কখনও এরূপ কাম্পিত হয়নি, কুণ্ঠিত হয়নি; অমলেশের ওই স্পৃষ্ট স্থানটা আজ যেন ওর অগ্নি জ্বালার মতই জ্বল্‌তে লাগ্‌লো। চোখ দুটী ও জোর করে মেলে অমলেশের মুখের দিকে তাকালো—, সত্যই কি ওই সুকুমার সুন্দর ফুল্ল মুখের অন্তরালে এক বিষের ছুরী লুকিয়ে আছে? অমিতা স্পষ্টই অনুভব করলো, অমলেশের যে দৃষ্টির অভ্যন্তরে একদিন সে পেয়েছিল সারল্যের স্নিগ্ধ আভাষ, আজ তা তীব্র আকাঙ্খায় জর্জরিত, ঝলসিত। কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভেবে সে ঈষৎ রুক্ষ কণ্ঠে ডাক্‌লো, "অমলেশ" অমলেশ তখন এক মধুর অনুভূতিতে ভরে উঠে যেন নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে দুধটুকু নিঃশেষ করছিল খোকনের মুখে। অমিতার ডাকে ওর সে নেশার আমেজ ফুরিয়ে গেল। সে তাকালো তার দিকে। অমিতা বল্‌লো—, "কালকের পেপারে যে দেখলুম একটা প্রাইভেট টিউটরের বিজ্ঞাপন—, তুমি কী তার দরখাস্ত করেছ"?

হঠাৎ অমিতার এরূপ প্রশ্নে ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেছ্‌লো অমলেশ, বল্‌লো, "কই করিনিতো"।

"কেন করতে তো পারো, পাচকবৃত্তির চেয়ে শিক্ষকবৃত্তিটা নিশ্চয় উত্তম এম-এর পক্ষে নয় কি? কথা বলছনা যে—, বলনা—"

কি বল্‌বে অমলেশ? ওর বাক্‌শক্তি তখন লুপ্ত হয়ে গেছ্‌লো। অমিতার পরিহাসের কণ্ঠটা ওর বুকে ঠিক তীক্ষ্ণ ছুরীর মত বিঁধছিল, অপমানে,

বেদনায় চোখদুটী জ্বালা করছিল। অমিতা ওর সঙ্গে এরূপ ব্যবহার তো কখনও করেনি, সে তার সুমিষ্ট স্বভাবের মধুরতায় ওর অন্তর পরিপূর্ণ করে রেখেছিল। তবে কী সেসব ওর নিছক অভিনয়? অমিতা ওকে ভালো বাসেনা? ভালো যদি না বাস্‌বে তবে কোন্ মেয়ে নিতান্ত ক্ষুদ্র স্তরের এক পাচক ঠাকুরের সাথে এত গল্পের উৎসে নিবিড় হয়ে উঠতে পারে? না-না সে হতে পারে না, অমিতা নিশ্চয়ই ওকে ভালোবাসে। ওর স্মৃতিপটে অমিতার দৈনন্দিনের একান্ত উদার ব্যবহারগুলি উজ্জল হয়ে উঠলো। তার ব্যথা সুনিবিড় নীরব দৃষ্টিতে ঈষৎ মুখের রং ফুটে উঠলো। ওর মনে হোল ওর প্রতি অমিতার এ আকস্মিক বিরূপতা আন্তরিক নয়, মনের অন্য কোনও উত্যপ্ততার রূপান্তর মাত্র। সে চোখ দুটী তুল্‌লো অমিতাকে বল্‌তে, "তুমি যেদিন স্পষ্ট অনুমতি দেবে, বল্‌বে, "অমলেশ তুমি চলে যাও"—সেইদিন আমি চলে যাবো। কিন্তু অমিতা তখন ঘরে ছিল না, বাইরে চলে গেছলো অনেক্ষণ।

* * * * *

সেদিন মিসেস মৈত্রর হার্টের দুর্বলতা" খুব বেড়ে গেলেও এখন সে কতকটা সুস্থ হয়েছে, তবে সম্পূর্ণ বিশ্রামের জন্য ওকে এখন বিছানাতেই থাক্‌তে হয়। প্রায় হপ্তা তিন লাবণ্য ফেরেনি—, সেদিন সে বিকেলবেলা যখন বেশ প্রসাধন করে বাড়ী যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, সেই সময় পেলো অমিতার একখানা চিঠি। অমিতা লিখেছে—

ভাই লাবু, তোর অনুমান ভুল নয়। তাই ভাবি যা'হোক তোর দুটী চোখ ঈশ্বর সৃষ্টি করেছিলেন—, এখন আমি বেশ বুঝতে পারি অমলেশের ভাবখানা যেন কেমন ধারা—, সত্যি আমি আশ্চয

হয়ে যাই ভাব্‌তে—, সংসারে তবে কী অসম্ভব বল্‌তে কিছুই নেই ? ওকে স্পষ্ট কথা, কঠিন কথা দুটো বল্‌তে যাই, কিন্তু পারিনে কিছুতেই ; আমার কাঁপা ঠোঁট দুটী ওর দারিদ্র-নিষ্পেসিত মুখের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। আমি যে ক্রমশঃ কী জটিল জালের মধ্যে জড়িয়ে পড়ছি—, সে তুই বুঝ্‌বিনে, নিজের উপর সব বিশ্বাসও যেন হারিয়ে ফেল্‌ছি। তোর দাদাকে খুলে বল্‌তে চাই সব কথা কিন্তু পারিনা, সঙ্কোচ ও কুণ্ঠা আমাকে বড়ই বিপর্যস্ত কোরে তোলে। নিজেকে মনে হয় ভীষণ অপরাধী। কিন্তু অমলেশের সান্নিধ্য আমায় বড়ই শঙ্কিত করে তুলেছে, তোর দাদা দুদিনের জন্য লাইনে বেরুচ্ছেন, আমি যে কী করে একা থাকবো বুঝ্‌তেই পারছিনা। অনেক ভেবে ঠিক করে ফেল্‌লুম, এ দুটো দিন তোর কাছেই থাক্‌বো। আশা করি মিসেস্ মৈত্র ধীরে ধীরে ভালো হয়ে উঠছেন। বাস্তবিক, মনের দুর্বলতা, দেহের ভীষণ ক্ষতি করে। তিনটের লোক্যাল ট্রেণে পৌঁছুবো, তুই আসিস্ তবে ষ্টেশনে"।

চিঠিখানা পড়ে লাবণ্য একটু হাস্‌লো, তারপর হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখলো তখন তিনটে বাজ্‌তে মাত্র পনেরো মিনিট দেরী ছিল, ও দ্রুত পায়ে যেয়ে মিসেস্ মৈত্রর ঘরে প্রবেশ করলো। বল্‌লো, "আমি আজ আর বাড়ী গেলেম না বুঝ্‌লি, এখুনি ষ্টেশন থেকে আস্‌ছি। সেই যে অমিতার কথা তোকে বলেছিলুম—, সে আজ আমাদের বোর্ডিংএ আস্‌ছে।" বলেই লাবণ্য ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, মিসেস্ মৈত্র কিন্তু এ সংবাদে মোটেই খুসী হতে পারলো না। একটী ছোট নিশ্বাস ওর বুক থেকে ঝরে পড়লো। তার কারণ—, কয়েকদিন আগে ও শাশুড়ীর চিঠিতে জেনেছে—, ওর স্বামী

নৈহাটীতে এক ধনী গৃহে প্রাইভেট টিউসনী পেয়েছে, এবং সেই ধনী ব্যক্তি বলেছেন—, "ওকে সরকারী চাকরী করে দেবেন"। মিসেস্ মৈত্র ভেবেছিল, লাবণ্য বাড়ী চলে গেলে ও স্বামীকে একখানা চিঠি লিখবে। সব পুরুষ মানুষই স্ত্রীকে ভুলে যেতে পারে, কিন্তু যে স্ত্রী স্বামীকে ভালোবাসে, সে তাকে ভোল্‌বার কল্পনা করতেও ব্যথা পায়। কিন্তু লাবণ্য তার এই কথাকে সমর্থন করে না। সে বলে, যে স্বামী দুই ফোঁটা কালীর সহায়তে স্ত্রীর সংবাদ রাখ্‌তে এতই উদাসীন—, কোনও স্ত্রীর সে স্বামীকে কিছুতেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিৎ নয়। তাই মিসেস্ মৈত্র এ কাজটা তার অজানিতে গোপনে সমাধান করতে চেয়েছিল।

"দূর ছাই, এখন তো অনেক দেরী ওদের ফিরতে—, ষ্টেশনে, যাবে, আসবে, এর মধ্যে ওর নিশ্চয়ই দু'কলম চিঠি লেখা হয়ে যাবে—" মিসেস্ মৈত্রর চঞ্চল মনটা দুর্ণিবার হয়ে উঠলো, স্বামীর ঠিকানার জন্য শ্বাশুড়ীর চিঠিটা বের করতে ও খাট থেকে নেমে মেঝেয় গিয়ে বস্‌লো—, তোরঙ্গটা খুল্‌বে বলে।

কিছুক্ষণ পর লাবণ্য ও অমিতা যখন ঘরে ঢুক্‌লো, ও তখন এত আত্ম-সমাহিত হয়ে ওদের বিয়ের সময় তোলা ফটোখানা দেখ্‌ছিল যে, ওদের আগমন জান্‌তেই পারেনি। ওর কাঁধের পিছন থেকে ঝুঁকে লাবণ্য বলে উঠলো, "একী এ-যে অমলেশের ছবি দেখতো অমু—"? ওর কণ্ঠে চম্‌কে উঠে মিসেস্ মৈত্র তাড়াতাড়ি ছবিখানা তুলে ফেল্‌তে ব্যস্ত হয়ে উঠলো, অমিতা তখনি ফটোখানা দেখে নিয়ে বল্‌লো, "হ্যাঁ তাইতো এ যে অমলেশের ছবি"।

মিসেস্ মৈত্র ওদের কথাবার্তা কিছুই বুঝ্‌তে পারছিল না, আর বোঝবার মত আগ্রহও তার ছিলনা, যে কাজের উদ্দেশ্যে ও তোরঙ্গ খুলেছিল, তা

সফল হোল না বলে, ওর মনে একটা আক্ষেপ জমে উঠেছিল। ও ছবিখানা তুলে রেখে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লো—, "তোমরা বস—, আমি চায়ের কথা বলে আসি—"

লাবণ্য সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে বল্‌লো—, "এ ছবিখানা তোর স্বামীর সঙ্গে তোলা নাকী রে—" ?

ছোট্ট একটী "হ্যাঁ" বলে, মুখরা লাবণ্যর খোঁচা থেকে পরিত্রাণ পেতে মিসেস্ মৈত্র চায়ের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তখন লাবণ্য ও অমিতার চিন্তা আলোড়িত অন্তরের এবং নীরব দৃষ্টির বিস্ময়ের ভাষা ওদের অধর প্রান্তকে মুখরিত করে তুল্‌লো। হাসি, উচ্ছ্বাস, দুঃখ বেদনা, কৌতুক, নিরাশা, আশা, বিস্ময়, ঘৃণা, অনুশোচনা প্রভৃতি নানা রূপ ছবিগুলি ক্ষণে ক্ষণে ওদের চোখের অভ্যন্তরে রূপান্তরিত হচ্ছিল।

* * * *

নিতান্ত অতর্কিতে অমিতার বোর্ডিং যাত্রায় অমলেশ যতখানি ক্ষুব্ধ ও আশাহত হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী ও ফুল্ল হয়ে উঠলো, কয়েক ঘণ্টা পরই অমিতা যখন বাড়ী ফিরলো, সুস্থ শরীরে নয়, দেহের উত্তাপ নিয়ে। ওর ভীষণ মাথা ব্যথা করছে, সমস্ত দেহে অসহ্য বেদনা, বোর্ডিঙের লেডি ডাক্তার বলেছেন—, "ওর ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে"। ওষুধের শিশি দুটি অমলেশের হাতে দিয়ে ওকে একটু বার্লি করতে বলে, ও কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে উপরে যেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো।

অমলেশের সারা অন্তর এক অনির্বচনীয় পুলকে ভরে উঠলো। তবে কী সত্যই ওর মনের আব্‌ছা আশার প্রদীপটি উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠবে ? ওর স্বপ্ন সফল হবে ? পুষ্পেন্দু বাড়ী নেই—, লাবণ্যও এত রাত্রে নিশ্চয়ই আর

আসিবে না, অমিতার সেবা ওকে নিশ্চয়ই করতে হবে—, প্রিয়ম্বদার রোগ পাণ্ডুর শীর্ণ মুখটা ওর চোখে মূর্ত হয়ে উঠলো, মূর্তিমান প্রভাতবাবুর নায়ক যেন ও বনে গিয়েছে, মনে বেশ একটা গর্ব অনুভব করলো। সুখ আপ্লুত অন্তরে রান্নাঘরে যেয়ে একটু বালি তৈরী করলো।

"এই যে বার্লিটুকু এনেছি খেয়ে নাও তো" ; কিছুক্ষণ পর অমলেশ, অমিতার ঘরে ঢুকে ওর শয্যাপ্রান্তে বস্‌লো। অমিতার মুখটা চাদরে ঢাকা ছিল, তার অভ্যন্তরেও একটু নড়ে উঠলো "খেয়ে নাও অমিতা, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে যে, মাথা কী তোমার বড্ড ধরেছে"? অমলেশ তার ললাটের উষ্ণতা অনুভব করতে, মুখের উত্তরীয়টা একটু সরিয়ে দিতেই—"য়্যাঁ তুমি? তুমি কোত্থেকে এখানে এলে—"? গভীর নিশীথে এক গোখ্‌রো সাপ দেখে যেন সে আঁৎকে উঠলো। কারণ শয্যায় যে ছিল, সে অমিতা নয়, মিসেস্‌ মৈত্র ওরফে অমলেশের স্ত্রী মাধবী দেবী।

পথচলা

বাস্তবিক,— একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ভাস্বর সংসারে তাঁর একমাত্র আদরের মেয়ে পূর্ণিমা ছিল একটু স্বতন্ত্র গোছেরই, যেন পশ্চিম-দিগন্তের সূর্যের মতই নিতান্ত খাপছাড়া। ওদের সমাজের প্রত্যেকটী স্ত্রী পুরুষের চোখে ও ছিল অদ্ভুত, রহস্যময়ী এক মেয়ে। চৌদ্দ পনেরো বছরের অনিন্দ্য ঝলমলে, আধফোটা ফুল সম্ভারে রজনীগন্ধার মত শুভ্র সুন্দর মেয়েটী, হাসবে, খেলবে, কথার ফুলঝুরী জ্বেলে পাতলা রঙিন ঠোঁটের প্রান্ত দুটী অনর্গল মুক্ত করে রাখবে, ঝর্ণার মত অশ্রান্ত গানে ওদের উৎসব অঙ্গনে উচ্ছ্বসিত হবে, চায়ের টেবল মুখরিত করে তুলবে, ভ্রমরের মত গুনগুনিয়ে সংসার কাননকে গীতিময়, ছন্দময় করে রাখবে, এইটুকু আশা ওর বাপ মা ওর কাছে প্রতিক্ষণে, প্রতি মুহূর্তে করতেন।

কিন্তু—, তা নয়; ও ছিল যেন ঠিক তারই বিপরীতমুখী। নদীর মত শান্ত, পাহাড়ের মত ধীর গম্ভীর; ও যে ভীষণ একরোখা মেয়ে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতো ওর অচঞ্চল গভীর ভাবময় চোখ দুটী।

প্রত্যেক দিন রুটিন বাঁধা ওর দৈনন্দিন কর্মস্রোতে ভেসে চলে, ঘুম থেকে জেগে বসে চায়ের টেবিলে, পড়তে যায় মেয়েদের স্কুলে, বিকেলবেলা আধুনিক সঙ্গীত শিক্ষা করে, ছুটীর অবসরে পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট বাঙ্গলা সংস্কৃতে পারদর্শিতা লাভের চর্চা করে, না হয় অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ের কাছে ইংরেজী সঙ্গীতে ওস্তাদ হবার সাধনা করে। মাঝে মাঝে নিজের না হয় অপরের গৃহের টী পার্টি জন্মোৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে, চায়ের টেবিলে

হৈ চৈ করে, শাড়ী ব্লাউজের চমক তুলে, টেনিস, পিংপং প্রভৃতি খেলে, রবিবাবুর গান গেয়ে ওরিয়েণ্টাল নাচ নেচে, মা, বাপের বন্ধু, বান্ধবীদের ফ্রেঞ্চ, জার্মাণ বুলি শুনিয়ে দিয়ে ওর সেদিনের কার্যতালিকা সমাপ্ত হয়। তবে ওর এ কর্মস্রোতে তরঙ্গ এবং উদ্দাম ছিল না, ঢিমে তালে যেন ওর গান বাজ্‌তো ওর চলার ছন্দে। তবু ওকে চেষ্টা করে প্রাণের তারে ওর ঝঙ্কার তুল্‌তে হোত, মা, বাপের সম্মান অক্ষুন্ন রাখ্‌তে, তাঁদের সুখী করতে, জন্ম পাওয়ার ঋণ তাঁদের কতকটা পরিশোধ করতে।

তবে ফাঁক পেলে এবং সুবিধে পেলে ও তার এই বন্দী জীবনটাকে ক্ষণকালের জন্যও মুক্ত কর্‌তে, ওর মণের অভ্যন্তরের প্রকৃত মানুষটীকে জাগ্রত ও চকিত করে তুল্‌তে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হোতনা, এবং সেই পথে চল্‌বার সহায়ের মত একটী গোপন পথও আবিষ্কার করেছিল। অবসর মত ও তার সে পথে স্বচ্ছন্দের পালখানি তুলে দিয়ে ওর ভরা সুখের তরণীখানি বেয়ে চলতো। যেমন ও নিত্যই মাথাধরা বা এমনি ছোটখাটো কোনও শারীরিক অসুস্থতার অজুহাতে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করতো, মা ইন্দ্রাণী ওর কপালে ওডিকোলন ঘষে দিয়ে বা ইউকেলিপটাস শুঁকতে বলে স্বামীকে অফিস পৌঁছুতে বা আন্‌তে অথবা সপিং করতে, সিনেমা দেখ্‌তে কোনও উৎসবে যোগদান করতে বাড়ীর বাহির হলেই ও তার সেই সোনালী মুহূর্তটুকু প্রাণভরে উপভোগ করতো। প্রাণের প্রাচুর্য জোয়ারে ও যেন নিবিড় মত্ত হয়ে উঠতো। যেন কোনও অলৌকিক স্পর্শ পেয়ে মণের নিভৃত প্রান্তের মানুষটী আনন্দে ঝল্‌মল্‌ করতো।

ওদের গাড়ীর বাঁশী দূরে বিলীন হয়ে গেলে, ও বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে কক্ষের দুয়ারটা বন্ধ করে দিয়ে, কাপড়ের কাণা তোলা

বড় আলমারীটার মাথায় সযত্নে কাগজে জড়ানো থাক্‌তো ওর চরকা, নামাতো তাকে খাটের উপরে, বেতের বাস্কেট বোঝাই করা একরাশ তুলো আলমারীর ভিতর থেকে বের করতো। এর পর ওর হাত দুখানি চরকার চাকায় ঘোরে, ক্রমে দ্রুত, অসম্বরণীয় হয়ে ওঠে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে সাদা তুলার রাশগুলো ঈষৎ পীতাভ সূতোয় পরিবর্তিত হয়। মেইল ট্রেণের মত ওর হাত চলে। যখন দূরে এলগিন রোডের প্রান্ত হতে ওদের গাড়ীর বাঁশী শোনা যায়, তখন ও চকিত সন্ত্রস্ত হাতে চরকা তুলে রাখে। ওর মা ইন্দ্রাণী অত্যন্ত সন্তর্পণ পায়ে, জুতোর হিলের টুক্‌টুক্‌ শব্দকে সাধ্যমত আয়ত্তে রেখে মেয়ের ঘরে এসে প্রবেশ করেন, স্বস্তির চোখে কিছুক্ষণ মেয়ের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের প্রেসক্রাইব ওষুধের ভালো ফলটুকু মনে অনুভব করে একটী শান্তির নিশ্বাস ফেলে ঘর থেকে বের হয়ে যান্‌।

তবে এ ভরা তরণী বেয়ে পূর্ণিমা ওর ভাগ্য-নদীতে বেশী দিন চল্‌তে পারলো না, তরী ডুবলো ; একদিন নিতান্তই ওর অতর্কিতে, ওর এক অসতর্ক মুহূর্তে ওর গোপন পথে চল্‌বার গোপনতম ধারাটী প্রকাশ হয়ে পড়লো। সেদিন পূর্ণিমার অন্তরের নিভৃত কেন্দ্রটী সুখের প্রাবল্যে পরিপূর্ণ হয়েছিল। তার কারণ ওর পুষ্পদা বলেছে, "আর খানিকটে সূতো হলেই যে খদ্দর প্রস্তুত হবে, তাইতে ওর একটী ব্লাউস, পুষ্পেন্দুর একটী পাঞ্জাবী বেশ তৈরী হতে পারবে"। ওর সাধনা সার্থক হবে, ওর হাতে তৈরী সূতোয় খদ্দর হবে—, এই কথা ভাবতে পূর্ণিমা পুলকের আতিশয্যে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। নিবিড় উৎসাহে আত্মবিভ্রম হয়ে শেষ সূতোটুকু সংগ্রহ করতে ও সেদিন বিকেলে চরকা নিয়ে বসেছিল। অথচ সেইদিন ওদের

সঙ্গোপনে

গৃহে ছিল ইন্দ্রাণীর জন্মোৎসব—. ওর পেটে নাকি কলিক ব্যথাটা উঠেছিল তাই সে উৎসবে যোগদান করেনি। তখন শরৎকালের বিকেল বেলার সুন্দর স্নিগ্ধ আলোটুকু ধরণীর প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে পড়েছিল, অতিথিবৃন্দের অভ্যাগমে পি-ভাস্থর গৃহখানি প্রাণ প্রাচুর্যে মুখরিত হয়ে উঠেছিল। ফটকের খানিকটা দূরে সুবিস্তৃত লনের এক ধারে কতকগুলি বাচ্ছা বাচ্ছা মেয়ে প্রজাপতির অনুকরণে ওদের রঙ্গিণ ফ্রকের পাখা মেলে দিয়ে একটা ইংরেজী গ্যাকটিং করে ইন্দ্রাণীকে অভিনন্দিত করছিল। ওদের ওই অভিনয় উপভোগ করতে করতে মিঃ ও মিসেস্ ভাস্থ সবান্ধবে গল্প গুজব করছিলেন। হঠাৎ এক সময় চীফ মেডিকেল অফিসারের মেয়ে টুটু মোডাক অপূর্ব ভঙ্গীতে চমৎকার একটী নাচ নাচ্‌তে, সভাস্থ আর সকলের মত ওর নাচের সেই অভিনব মাধুরীতে ইন্দ্রাণী অপরিসীম মুগ্ধতায় গলে গেলেন।

"বেবী, ও বেবী (পূর্ণিমার ডাক নাম) একবার বারান্দা থেকে দেখ্ টুটু বিলেত থেকে কী সুন্দর এক নাচ শিখে এসেছে" বল্‌তে বল্‌তে প্রায় ছুট্‌তে ছুট্‌তে, পড়তে পড়তে ইন্দ্রাণী সিঁড়ি বেয়ে দ্বিতলে মেয়ের দ্বার সমীপে এসে উপস্থিত হলেন। পূর্ণিমা কল্পনাও করতে পারেনি এ সময় জননী যে ওর দুয়ারপ্রান্তে আসবেন। ও ভেবেছিল যখন অতিথি অভ্যাগতদের খেলাধূলা, মিষ্ট আপ্যায়নের সমাপনে, প্লেট পেয়ালা, কাঁটা চামচের টুংটাং শব্দ চায়ের টেব্‌লে গুঞ্জন তুল্‌বে তখন ও নিজেকে গুছিয়ে নেবে। ইত্যবসরে এই অভাবনীয় কাণ্ড ঘট্‌লো। ও তখন আত্ম-সমাহিত হয়ে দুয়ার অর্গল বদ্ধ না করেই নিজের কাজের মধ্যে তন্ময় হয়ে গেছ্‌লো। রাবদৃপ্ত মধ্যাহ্নের আকাশে হঠাৎ যেন অমাবস্যার ঘন কালো

নিশীথিনীকে দেখে মা নিদারুণভাবে চমকে উঠলেন। "একী একী" অতি অস্ফুটে তঁরে বিহ্বল কণ্ঠ হতে নিঃসৃত হোল—"এই কী পূর্ণিমা, এই কী বেবী? এই কী একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের মেয়ে বেবী—"? আর তাঁর অবরুদ্ধ অধরপ্রান্ত হতে কথা সরলোনা, নির্বাক, নিস্পন্দ হৃদয়ে তিনি স্তব্ধভাবে বারান্দার একখানি শোফার পরে ধপ করে বসে পড়লেন।

* * * *

তবে এ মঞ্চের অভিনয় এইখানেই পরিসমাপ্তি লাভ করলো না অথবা যবনিকাপাত হোল না, জের তার টেনে চল্লো আরও অনেক দূরে। পূর্ণিমার মত একটী আধ ফোটা কিশলয় মেয়ের পক্ষে যতখানি সম্ভব গোপন কার্যতালিকা তা প্রকাশ হয়ে পড়লো। এই যেমন দেশী সভা সমিতিতে যোগদান করা, দেশ নায়কের মুখে বক্তৃতা শোনা প্রভৃতি। সোফারকে ডেকে মিঃ ভাস্থ অগ্নিমূর্তিতে বল্লেন, "এইও উল্লুক—, টুম্‌রা টুম্‌রা সাট্ বাট্ হ্যয়, টুম মিসি বাবাকো স্কুল পৌছাঙ্গে, লে আঙ্গে—, টুম কিস্‌কো হুকুম্‌সে উন্‌কো ইটার উটার লে যাটা হ্যয়—"? এ কথার সোফার বচন সিং কী বা উত্তর দেবে? সে যে পূর্ণিমার অজস্র দক্ষিণাতে পকেট পূর্ণ করেছে, সে কথা তো আর প্রকাশ করতে পারে না। কাজেই নত আননে মৃত্তিকাপানে তাকিয়ে চুলের ভিতর অঙ্গুলি সঞ্চালন করতে করতে মনিবের কথার উত্তর দেবার পূর্বেই ওর নোক্‌রী গেল খতম হয়ে; এবং তারই সঙ্গে পূর্ণিমার পথ চল্‌বার ধারায় কতকগুলি নিয়মকানুন নিয়ন্ত্রণ করা হোল। তবে "তুমি অমুক জায়গায় যেও না, বা অমুক কাজ কোর না" এরূপ কোনও স্পষ্ট আদেশ বাপ মা তার উপরি

জারী করতে পারলেন না, কারণ মেয়েটী যে ছিল তাঁদের ভীষণ এক-রোখা—, এ কথা তাঁদের জানা ছিল। শুধু অস্পষ্ট ভাবে শাসনের একটা বেড়াজাল তাকে ঘিরে রইলো। তা না হয় থাকুক পূর্ণিমার চলার পথ শাসনের গণ্ডির আবেষ্টনে, তার জন্য পূর্ণিমা মোটেই দমলো না, অথবা এই অভাবনীয় ব্যাপারে ভীরু পাখীটির মত সঙ্কুচিত হোল না, বরং ওর মনে হোল ও আজ অনাবিল স্বচ্ছন্দ, অবারিত মুক্ত; যেন এতদিন খাঁচায় বন্ধ ছিল, এখন সুন্দর নীল আকাশে ডানা মেলে উড়তে পেয়েছে। যা কিছু করে স্পষ্ট এবং অকুন্ঠিত ভাবে, বাপ মার মত আদায় কোরে। মা বাপ ওর আব্দার পূর্ণ করতে ওকে অনুমতি দিলেও, বাপের মনের নিভৃত প্রান্তর শঙ্কায় সন্ত্রস্তে আকুলিত হয়ে ওঠে—, "নাঃ এ মেয়ে দেখ্ছি আর সরকারী চাকরী রাখ্তে দিলে না, খতম করে তবে ছাড়বে"।

মা ভাবেন—, "মেয়ে মান সম্ভ্রম একেবারে জলাঞ্জলি দিল, লণ্ডন থেকে ফিরে অজিৎ কি এই ভুতুড়ে অজ মেয়েকে বিয়ে করতে চাইবে"? মা, বাপের অধীর ব্যাকুলিত মনে মেয়েকে কেন্দ্র করে কত চিন্তা উত্থিত হয়, কত কল্পনা, জল্পনা ভাঙ্গে গড়ে; যেমন সুদূর মসৌরি বোর্ডিং অথবা সিম্‌লা পাহাড়ে মেয়েকে পাঠানো, কিংবা সাগরপারে ভাবী জামাই অজিতের তত্ত্বাবধানে মেয়েকে রাখা প্রভৃতি। কিন্তু দিনের গতি চলে যায়, অথচ স্নেহের আতিশায্যে তাঁদের এই কল্পনাগুলি বাস্তবে আর পরিণত হতে পারে না। কারণ তাঁদের ওই একটী মাত্র মেয়ে নয়নের মণি, বুকের ধন। তবে মেয়ে যাতে না প্রশ্রয়ের শিখরে চড়তে পারে এর জন্য নিরন্তর তাঁদের চকিত দৃষ্টি সতর্ক হয়ে থাকতো। এবার যে নূতন ড্রাইভার

বাহাল হয়েছে—সে আর পূর্বের মত কোমল নয়, দস্তুরমত রুক্ষ প্রকৃতি তার। একদিন বিকেল বেলা ইন্দ্রাণী লাউঞ্জরুমের দক্ষিণ খোলা জানালার ধারে বসে পিয়ানোর একটী ইংরাজী গানের গুঞ্জন তুলেছিলেন। তাঁরই সুমুখে একখানি সোফায় উপবিষ্ট কর্মক্লান্ত ভাসুর সাহেব পাইপে মৃদু টান দিতে দিতে তা উপভোগ করছিলেন।

পূর্ণিমা গানের স্কুলে গিয়েছে, সে ফিরলে গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে যাওয়া হবে। কিছুক্ষণ পর গেটের ভিতরে তাঁদের মস্ত বড় নীল রঙের ক্রাইস্‌লার "কার" খানা প্রবেশ করলো। চালক তার সদ্য বহাল করা ইমাম খাঁ নয়, স্বয়ং পূর্ণিমা। "একী সোফারটা গেল কোথায়"? ওইদিকে তাকিয়ে ইন্দ্রাণীর গান থেমে গেল, মা বাপ ত্রস্ত পায় বারন্দায় বেরিয়ে এলেন। তাঁদের সুমুখে লাল সুর্‌কী রাঙ্গা পথটায় গাড়ীখানা স্টার্ট রেখেই দাঁড় করিয়ে মা বাপের প্রশ্নোদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে পূর্ণিমা বল্‌লো—, "জানো পাপ্‌, হাজরা পার্কে বেশ ভালো আজ একটা সভা ছিল, বড় বড় দেশ নেতারা আসবেন ; সঙ্গীত সঙ্ঘের ফেরৎ সোফারকে বল্‌লুম গাড়ী ওইদিকে ফেরাতে তা ও কিছুতেই কথা শুন্‌লো না, বললো, "মেমসাবকো হুকুম নেই হ্যয়—"

"ও এমন কিছু অন্যায় কথা বলেনি বেবী, সত্যই বলেছে—" গাড়ীর দরজায় কুনুইর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ইন্দ্রাণী, মেয়ের মুখের দিকে দৃপ্ত চোখে তাকিয়ে রুক্ষ গলায় বল্‌লেন—, "তুমি যেখানেই যেতে চাওনা কেন, আমায় জিজ্ঞেস করেছিলে"?

মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আব্দারের কণ্ঠে পূর্ণিমা বল্‌লো, "তোমায় কখন জিজ্ঞেস করবো মামী? তুমি সকাল থেকে রইলে টেলিফোনের

ঘরে পাপের অফিসরুমে লোক এল, বিকেলবেলা স্কুল থেকে ফিরে দেখলুম তোমরা কেউ বাড়ী নেই"।

এ কথার বাপ মা কিছুই উত্তর দিতে পারলেন না, বল্‌তে চেয়েছিলেন, "কেন একদিন তোমার ও সব সভা-সমিতিতে না গেলে কী চলে না? কিন্তু সে কথা তাদের ঠোঁটে এসে বাধা পড়লো, কেননা কোনও বাঙ্গালীর ছেলে মেয়েই তা বল্‌তে পারে না, সে যতই সাহেবী ভাবাপন্ন হোক্‌না কেন; হয়তো বা অন্তরের তলদেশে গোপন রাখতে পারে।

চিন্তিত মুখে বাপ বল্‌লেন—, "তা তুমি কী ড্রইভারকে মেরে ধরে তাড়িয়ে দিলে, না কি করলে আগে বল" ?

"এই যে পাপ বল্‌ছি এখুনি, গাড়ীখানা গ্যারেজে তুলে দিয়ে আসি" বলে পূর্ণিমা, গাড়ীখানা প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাকে আবার সেল্‌ফ স্টার্ট দিয়ে জাগ্রত করে তুল্‌লো। গাড়ী গ্যারাজ অভিমুখে পা পা করে চল্‌তে সুরু করলো।

মা, বাপ বারান্দায় দুখানা বেতের চেয়ারের উপর বস্‌লেন, মুখে তাঁদের চিন্তার মেঘচ্ছায়া বিস্তার করেছে। মিনিট কয়েক পরে ঈষৎ ম্রিয়মান কণ্ঠে পি-ভাস্থ বল্‌লেন, আচ্ছা রাণু বলতো, আমাদের বাড়ী আসে বিলিতি দৈনন্দিন, মাসিক, সাপ্তাহিক পত্রিকা, বেবী এইসব দিশি খুঁটানাটী খবরগুলো কী করে সংগ্রহ করে" ? মিহি কণ্ঠস্বরে মৃদু ঝঙ্কার দিয়ে ইন্দ্রাণী বল্‌লেন—, "সংগ্রহ করবে কোত্থেকে আর, তুমি নিজেই দুধ কলা দিয়ে ঘরে সাপ পুষেছ; সত্যি কী বখাটে ছোঁড়াই না তোমাদের ওই পুষ্প—, পড়বে না শুন্‌বে না দিন রাত ওই ছবি, ছবি আর ছবি—! আহা ছবি এঁকে উনি যেন দুদিনে বাদশা বনে যাবেন; দেখো তুমি ও ছেলে কিছুতেই বি-এ পাশ করতে পারবে না"।

বল্‌তে বল্‌তে কথার উৎসে, যে একখানি আবরণ নিরন্তর ইন্দ্রাণীর প্রকৃত মনকে আড়াল করে রাখতো, তাঁর সেই আবরণখানি খসে পড়লো। হাতে রেশমের রুমাল থাকা সত্ত্বেও, শাড়ীর আঁচলে ঘামে ভেজা মুখখানি শুক্‌নো করে মুছে ফেলে যেমন করে প্রত্যেক বাঙ্গালী মেয়ে ঘরোয়া ভাবে স্বামীর সঙ্গে কথা বলে, সেইরকম ভাবে তিনি বল্‌লেন—, "সখ কত দেখোনা ছেলের, সেই যে কথায় বলে—, "কত সখ্ যায়লো চিতে, মলের আগে চুটকী দিতে"! এও হয়েছে যেন তাই। ঘরে রয়েছে উন্নুনে হাঁড়ী চড়ানো, উনি করছেন শিল্পচর্চা, উনি করবেন দেশসেবা। ওরে বাস্‌রে সে তুমি দেখো যদি, সে যে কত রকমের দৈনিক, মাসিক, সাপ্তাহিক সব বাঙলা কাগজপত্র জমিয়ে, সে যেন এক ছোটখাটো পাহাড়ের সৃষ্টি করেছে"।

সত্য কথাই মিসেস্ ইন্দ্রাণী বলেছিলেন—, ওই এক বিশ্ব-বখাটে ছোঁড়া তাঁদের সংসারে এসে জুটেছিল। চাল নেই, চুলো নেই—, অর্থাৎ কোলকাতায় ভ্রমহল্লা বাড়ী নেই, গাড়ী নেই—, থাকে কোন্ সুদূরের বাঙলার নিভৃত অঞ্চলের এক অজ গ্রামে, সহরে এসেছে ওর খুড়ীমার অনুজ অর্থাৎ পি-ভাসুর গৃহে থেকে কলেজে পড়বে বলে। তা ওর কী সাজে কখনও শিল্পসাধনা করা? সাজে কাব্যচর্চা করা? ও যে পাড়াগাঁয়ের নিতান্ত দরিদ্র ঘরের এক নিঃস্ব ছেলে। ও দেশের পাঠশালায় বিদ্যাচর্চা শেষ করে, ভিক্ষা করে, অথবা যেমন করে হোক্ সহরে থেকে স্কুল কলেজে পড়বে, পাশ করবে, চাকরী করে টাকা এনে বাপের হাতে তুলে দেবে। ওর মা অনেক কাল আগে মারা গেছেন, ওর বাপের এ পক্ষের ছেলেমেয়েগুলি প্রায় অনাহারে মরছে, ওর বাপ ওরই উপার্জনের আশায় চেয়ে আছেন। যত শীঘ্র সম্ভব বিদ্যাচর্চা ওকে শেষ করে সংসারের সব দায়ীত্ব গ্রহণ

করতে হবে। সুতরাং ওর কী সাজে কখনও আজে-বাজে কাজে সময় অপব্যবহার করা ?

সেবার ও প্রবেশিকা পরীক্ষায় জলপানি পেয়ে কতকগুলি চিত্রশিল্পের সরঞ্জামাদি, খানকতক কবিগুরুর কবিতার বই আর একখানা ওমরখৈয়াম কিনেছিল। ওরে বাসরে ওই বইগুলো ওর বাড়ীতে দেখে—, সে কী হৈ হৈ কাণ্ড— ; পয়সাগুলো ও নাকি একেবারে জহন্নামে দিয়েছে। ছিঃ ছিঃ যে বইতে এক বৃদ্ধ ও এক যুবতীর ছবি পাশাপাশি রয়েছে, সেই বই ওদের বংশের ছেলে হয়ে পুষ্পেন্দু যে কেমন করে কিন্‌লো, এ বিষয় বিস্তর সমালোচনা করেও তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেননি। এর পর পুষ্পেন্দু যখন কোলকাতা ফির্‌লো, তখন ওর টেব্‌লে কবিতার বই কেউ দেখতে পায়নি, হয়তো বা ও পুড়িয়ে দিয়েছিল। না হয় বিলিয়ে দিয়েছিল। এমনি করে সে তার কাব্যমধুর প্রাণটাকে মরুস্থান করে তুললেও, প্রিয় চিত্রশিল্প সাধনাকে আজও বিসর্জন দিতে পারেনি। নির্জনে অবসর মত ও ছবি আঁকে। সংসারে ওর এই নিভৃত সাধনাকে কেউ না সমর্থন করলেও, করতো একজন—; সে পূর্ণিমা। যে পূর্ণিমার চলার পথের ও ছিল সাধনার প্রতীক—, যে পূর্ণিমার ব্রত-প্রদীপে সেই জ্বালিয়েছে উৎসাহের আলো, আশার রশ্মি—, দিয়েছে প্রেরণা ; একমাত্র সেই যার দেশজননীকে ভালোবাস্‌বার পূজার্চনাকে সমর্থন করে এসেছে সংসারে, সেই পূর্ণিমা ওর ছবিকে, ওর সাধনাকে, সাধনার প্রতি জৈবকণাকে হৃদয়ের সাথে গ্রহণ করেছিল, গভীর ভাবে ভালোবাস্‌তো, শ্রদ্ধা এবং স্নেহ করতো।

পি-ভাসু ঘনঘন পাইপে টান দিয়ে দাঁতের ফাঁকে সেটাকে চেপে রেখে গম্ভীর গলায় বললেন, "আজই আমি দিদিকে লিখে দিচ্ছি, তার

ভাসুরপোর আমার বাড়ীতে কিছুতেই স্থান হবে না, পড়া তার হোক্ চাই না হোক্"।

ইন্দ্রাণীর স্বামীর সমতপ্ততায় প্রজ্বলিত হয়ে তাঁকে ইন্ধন জোগালেন। কারণ তিনি কোনও দিন চাইতেননা ওই খদ্দরপরা অজ্ঞ পল্লীর ছেলেটী তাঁর ভবনে বাস করে। এতদিন স্বামীর কাছে কোনও সাড়া না পেয়ে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে পারেননি।

পূর্ণিমার কাণে যখন ভেসে এল, পুষ্পেন্দু চলে যাবে, ওর পুষ্পদা চলে যাবে, তখন ও যেভাবে চমকে উঠলো, সে চমক ওর জীবনের কিশলয়ে এই বুঝি সর্বপ্রথম। ছুটতে ছুটতে প্রায় রুদ্ধশ্বাসে এ বার্তা সত্য কি, এবং যদি সত্য হয় এর কারণ কি এই তত্ত্ব অনুসন্ধান করতে ও যেয়ে প্রবেশ করলো পুষ্পেন্দুর কক্ষে। ভাসু সাহেব সরকারের নিকট যে ঘরটী গুদামরূপে ব্যবহার করতে পেয়েছিলেন, সেইখানি তিনি দূর-সম্পর্কের ভাগ্নে পুষ্পেন্দুকে সদ্ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। ঘরের এক কোণায় একখানি কেরোসিন কাঠের টেবিলের সুমুখে নতমুখে বসে পুষ্পেন্দু একখানি কলেজের বই পড়ছিল। পূর্ণিমার পায়ের শব্দে ও চকিত হয়ে চোখ তুলে ওর পানে তাকালো। ওর টেবলটায় ভর করে দাঁড়িয়ে পূর্ণিমা জিজ্ঞেস করলো, "পুষ্পদা শুনলেম তুমি নাকি চলে যাবে এ কথা কি সত্যি"?

"সত্যি বোন্—" বইখানির পাতা অনাবশ্যক ওল্টাতে ওল্টাতে পুষ্পেন্দু পূর্ণিমার ব্যথা ছলছলে অশ্রুসজল চোখ দুটীর পানে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে, জানালার বাইরে দিগন্তের ঘন নীল-প্রান্তে ওর উদাস দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে।

পূর্ণিমা জিজ্ঞেস করলে, "কেন পুষ্পদা তুমি চলে যাবে"?

ওই দিকেই তাকিয়ে থেকে পুষ্পেন্দু বললো—, "মামীমা যে বলেছেন বেবী—" একটু নীরব থেকে পুষ্পেন্দু পুনরায় বললো—, "তোমায় আমি নাকি জহন্নামের পথে নিয়ে যাচ্ছি—" আবার সে একটু থেমে বললো—, "তবে মামা বলেছেন—, আমি যদি ওই আজে-বাজে ছবি আঁকা ছেড়ে দি—, ছাইভস্ম কাগজপত্রগুলো না কিনি, নিতান্ত সুসভ্য ছেলের মত শুধু পড়াশুনা করি, তা'হলে অন্ততঃ পরীক্ষা পর্যন্ত আমি থাক্‌তে পারি—" বলেই হঠাৎ পুষ্পেন্দু অকারণ অদ্ভুত এক হাসিতে ঘরখানা কম্পিত করে তুললো!

পূর্ণিমা কিন্তু ওর বিকৃত কণ্ঠের এই হাসির উৎসে যোগদান করতে পারলো না, তবে ও মনের মধ্যে বেশ একটা আনন্দ অনুভব করলো, স্প্রীঙের মত লাফিয়ে উঠে, ঝর্ণা মেয়ের মত চপল কণ্ঠে বললো—, "সত্যি পুষ্পদা পাপ এই কথা বলেছেন? তোমার পায়ে পড়ি ভাই তুমি কিছুদিনের মত শিল্প সাধনা স্থগিত রাখ, ভালো ছেলেটীর মত শুধু তাঁদের কথামত পড়াশুনাই করে যাও। আর তোমার যা অভাব অভিযোগ হবে আমাকে জানিও আমি নিশ্চয়ই তা পূর্ণ করবো। আমার তোমার কাছে এইটুকু শুধু অনুরোধ—, তুমি এখানে থাকো"।

এবার পুষ্পেন্দুর মেঘমলিন মুখটা হাসিময় হয়ে উঠলো। সে জানলার বাইরে থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে, স্নিগ্ধভাবে পূর্ণিমার মুখের উপর মেলে রেখে বল্‌লো "আজ না হয় পূর্ণিমা আমি রাখ্‌লেম তোমার কথা—; কিন্তু চিরকাল, চিরদিন আমি কী রাখতে প্যা্রবো তোমার অনুরোধ? না তুমি পারবে এমনি করে চিরটা কাল তোমার স্নেহজালে আমায় জড়িয়ে রেখে দিতে—"?

এই কথাগুলি পুষ্পেন্দু কথার পর কথা সাজাতে যেয়েই বলেছিল,

কোনও গভীর ভাব নিয়ে বলেনি। কিন্তু পূর্ণিমা হঠাৎ ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠলো। যেন ওর নিভৃত মনের কোন্ গোপন দ্বারের কোন্ গোপন কুলুপ খুলে গিয়েছে, তাকে বন্ধ করতে ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। যেন সকাল বেলার অরুণ আলো ওর কপোল দুটিকে রক্তিম করে তুললো। নতমুখে ও বল্লো—, "কেন পারবোনা পুষ্পদা ? আমাদের আজকের এই স্নেহজালকে চিরবন্ধনে নিবিড় করে রাখতে নিশ্চয়ই পারবো। যখন যতদূরে যেখানেই আমরা থাকিনা কেন—আমাদের অন্তরের সুগভীর ভালোবাসা, আমাদের স্নেহ-বন্ধনকে আরও গভীরতম করে তুল্‌বে। শুধু তুমি আস্‌বে আমার ব্যাথার অশ্রু-সজল দিনে আমার অতিথি হয়ে, আর তুমি তোমার গভীর দুঃখের দিনে আমায় স্মরণ করবে। তুমি বল আজও অরুণ আলোর এমনই সুদূর স্নেহতেই তো কমল দল মেলে বিকাশিত হয়ে উঠেছে, পূর্ণিমা রাত্রে নদী উছলিত হচ্ছে ; তা'হলেই আমাদের পরস্পরের ভালোবাসাও নিশ্চয়ই দূর থেকে সার্থক হতে পারবে। এ কথাব কোনও উত্তর পুষ্পেন্দুর নীরব কণ্ঠস্বর হতে নিঃসৃত হোল না, ও শুধু আনমনা ভাবে পূর্ণিমার—, পূর্ণিমার আকাশের মত সুন্দর ঝলমলে মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

পুষ্পেন্দু যেমন করে একদিন ওর কাব্য-প্রিয় চিত্ত হতে কবিতার মায়াময় ছায়াখানি দূরে নিক্ষেপ করেছিল, সেইরূপে আজ যেন কোনও অলৌকিক স্পর্শ পেয়ে ওর শিল্প-মধুর প্রাণটাকে অচিরে চির সুপ্তিতে আচ্ছন্ন করে ফেললো, শিল্প সরঞ্জামগুলিতে আগুন ধরিয়ে দিল, খবরের কাগজ পড়া ছাড়লো, নিতান্ত শান্ত সুবোধ ছেলেটার মত পাঠ্যপুস্তকের পাতায় তন্ময় হয়ে রইলো।

তা—না হয় থাকুক ও পাঠ্য পুস্তকের পাতায় তন্ময় হয়ে, তাই বলে ইন্দ্রাণীর কাছে এত সহজে নিস্তার পেলো না। সন্দিগ্ধের ফাটল যেখানে একবার ধরেছে; তা হুহু করে বেড়েই চলবে; সেইজন্য বোধহয় "যত দোষ নন্দ ঘোষ" এই প্রবাদ বাক্যটী পুষ্পেন্দুর পরেই সত্য প্রমাণ করতে সুরু করলো।

* * * *

সেবার বড়দিনের সময় পুষ্পেন্দুর খুড়ীমা অর্থাৎ পি-ভাসুর দিদি দীর্ঘদিন পর ভ্রাতৃভবনে বেড়াতে এসেছিলেন। বয়স তাঁর চল্লিশের কোঠায় চল্‌ছে, সহরে জন্ম হলেও শৈশবে বধূটি হয়ে পল্লীগ্রামে বাস করবার দরুণ, স্বভাবে, চরিত্রে বেশ-ভূষায় আড়ম্বর-হীণ নিতান্ত সাদাসিদে এক পল্লীবালা হয়েছিলেন। স্টাইলের ফ্যাসানের গন্ধ যে কিরূপ তা জান্‌তেন না, পরতেন সস্তা দরের কোরা মিলের কাপড়, শীতকালে গায়ে একটী জামা দিতেন, তা নাহলে তাও নয়। এয়োতির চিহ্নস্বরূপ হাতে লৌহ ও শঙ্খবলয় ভিন্ন আর কোনও গহনার বাহুল্য ছিল না। সত্যি, এঁকে নিয়ে ভাসু-পরিবারে এক বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয়েছিল। না জানেন সাহেব বাড়ীর কেতাদুরস্ত কায়দা—, চালচলন; এ বাড়ীর দাসদাসী নাকি এ বিষয় তাঁর চেয়ে অভ্যস্ত।

মিঃ এবং মিসেস্ ভাসু অনুযোগ করলে তিনি স্পষ্টই বল্‌তেন—, "ওসব জামা জুতো পরা আমার বাপু অভ্যেস নেই, আমি পারিনে ওসব"। তিনি নগ্নগায়ে জানালার স্ক্রীণ সরিয়ে সেখানে যেয়ে দাঁড়াবেন, সেই বেশেই বন্ধু বান্ধবের সুমুখে বেরোবেন, নগ্নপায়ে যেয়ে

মোটারে চড়ে বস্‌বেন। উপরন্তু তিনি সহোদর পি-ভাস্থকে সাহেব বলে ভাবতেই পারতেন না, মনে করতেন কৈশরের ও শৈশবের সেই ছোট ভাইটা; ভাই পাঁচুগোপাল বলে তিনি সকল সময় সকলের স্থমুখে কথা বল্‌তেন। সেই সময় মিঃ পাঁচুগোপালের মনের প্রান্ত অস্বস্তিতে জ্বালাময় হয়ে উঠলেও, নীরবে সহ্য করতেন এবং সাধ্যমত বোনের সান্নিধ্য এড়িয়ে চল্‌তেন। তা না' হলে আর উপায় বা কী? আপন সহোদরাকে তো গৃহ হতে বহিস্কৃত করে দেওয়া চলে না। তবে কথা হচ্ছে এই ধৈর্যের বাঁধনেরও একটা সীমা আছে। সেইজন্য এমন একটা দিন এল, যেদিন পি-ভাস্থ বাধ্য হলেন ধৈর্যহারা হতে, দিদির স্নেহাতিশয্যে অস্থির হ'য়ে তাঁকে গৃহ হতে বহিস্কৃত করা ভিন্ন আর কোনও পথ দেখ্‌তে পেলেন না।

সেদিন সকালবেলা পি-ভাস্থ চায়ের পর্ব সমাপনের পর নিজের ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। এমনই সময় দিদি স্নান সেরে ছাদে কাপড়খানি শুখুতে দিয়ে অনুজের কক্ষে এসে প্রবেশ করলেন।

তাঁর পায়ের শব্দে পি-ভাস্থ চোখ তুল্‌তে তিনি বল্‌লেন—, "হ্যাঁরে পাঁচু, পুনু তো বেশ ডাগরটী হয়েছে—, তা ওর বে-থার কিছু ঠিক করছিস্‌নে—; তা কিন্তু ওকে আমাদের পুখুর সঙ্গে বেশ মানাবে—, আর দুটীতে ভাবসাবও" বল্‌তে বল্‌তে তাঁর গলার স্বর হঠাৎ থেমে গেল, কারণ ভাস্থ সাহেবের কণ্ঠে যেন নিদারুণ এক ক্রোধের বোমা ফেটে পড়লো। ঘর কাঁপিয়ে চীৎকার করে তিনি বল্‌লেন, "সকালবেলা আমার কাজের ক্ষতি তুমি কোর না—, আমার মেয়ের বিয়ের ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না"।

বলে তিনি খবরের কাগজখানা মেঝেয় নিক্ষেপ করে রাগে কাঁপ্‌তে

কাঁপ্তে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়াতে সরলপ্রাণা বোনটীর সরল মুখের ছবিখানি চোখের সুমুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে মুখটা তাঁর বিদ্রূপ হাসিতে নিবিড় হয়ে উঠলো। একখানা ইজিচেয়ারের উপর বসে চুরুট টান্তে টান্তে তিনি নিজের মনে হাস্তে লাগলেন।

ইন্দ্রাণী কিন্তু স্বামীর মত নীরব হাস্যে ননদিনীর এই উক্তিগুলি বরদাস্ত করতে পারলেন না। একে ননদের কুসংস্কারের উৎপীড়নে, অনাড়ম্বর চালচলনের অত্যাচারে নিদারুণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। যে আগুন তাঁর মনে এতদিন জ্বলছিল, আজ তা যেন বারুদের মতই ফেটে পড়লো। এবং "যত দোষ নন্দ ঘোষ" এই প্রবাদ বাক্যটীর সত্য প্রমাণ করে, সেই বারুদের আঁচ লাগলো যেয়ে পুষ্পেন্দুর গায়ে। তপ্তস্বরে ইন্দ্রাণী স্বামীকে বল্লেন—, "তুমি জানো কী এ সব কারসাজি কার? তোমাদের ওই পুষ্পর—, ওই খুড়ীকে দিয়ে এ প্রস্তাব করিয়েছে—, তখনই আমি বলেছিলুম—, দুধ কলা দিয়ে ও কাল-সাপ পুষ না ঘরে, বিদায় কর। তখন তো আমার কথা শুন্লে না—, কিন্তু ভেবে দেখেছ এখনকার মেয়ে, এখনকার ফ্যাসানে যদি বলে—, "ওই পুষ্পকে ছাড়া বিয়ে করবো না" আমাদের ওই একটী মাত্র মেয়ে তখন কী উপায় হবে বলত" ?

স্ত্রীর এই কথাগুলি ভাসু সাহেবের মনের অভ্যন্তরকে মুহূর্তে চকিত করে তুল্লো, "বাস্তবিক ইন্দ্রাণীর কথাগুলি খাঁটী সত্যি, সংসার অঙ্গনে অসম্ভব বল্তে কিছুই নেই—, উপরন্তু এইগুলি তো প্রেমের কারবার"। সেইদিন, সেই মুহূর্তে মিঃ ভাসু তাঁর মনের পথ ঘুরিয়ে দিলেন বিপরীত দিকে—, "না না ওসব কেউটে সাপ যত শীঘ্র বিদায় করা যায় ততই

ভালো, আত্ম রেখে ধর্ম তবে পিতৃলোকের কর্ম"। সেইদিন তাঁর বিদায় নোটিশ দিদি ও পুষ্পেন্দুর পরে জারী হয়ে গেল।

পুষ্পেন্দু যখন এই কথাগুলি শুনলো, লজ্জায় মর্মরিত হয়ে প্রায় মিনিট কুড়ি মাথা তুলতে পারলো না। খুড়িকে স্থমুখে পেতেই নিতান্ত অগোছাল ভাবে বলে উঠলো—, তোমাদের সংসার থেকে তো একটু সাহায্য-স্থবিধে পাবার উপায় নেই—, নির্বিঘ্নে যে পড়াশুনাটুকু শেষ করবো, সেটুকুও কী তোমরা আমাকে করতে দেবে না—" ?

খুড়িমা যেন আকাশ থেকে খসে পড়লেন—, "কেন কী হয়েচে খোকা—" এ কথাটুকু তাঁর ঠোঁট থেকে বের হতে না হতে পুষ্পেন্দু বলে উঠলো "হবে আর কী ? হয়েছে আমার শ্রাদ্ধ—, দিয়েছ আমার পিণ্ডি ; তুমি এসেছ ভাইএর বাড়ী বেড়াতে—, তোমাকে কে সেখানে ঘটকালী করতে বলেছিল—" ?

এইবার খুড়িমা পুষ্পেন্দুর মর্মকথা উপলব্ধি করতে পারলেন। বিস্ময়ের বড় বড় চোখ ছুটী তার মুখে মেলে রেখে বিস্ময়ের কণ্ঠে বললেন—, "তাতে হয়েছে কী পুষু ? অত রাগ করছিস কেন ? সোমত্ত বয়সের মেয়েছেলে ঘরে থাকলেই বে-থার কথা হয়েই থাকে। তার উপর পুনু আমার বাপের বংশের মেয়ে—, বেশ পিসি ভাইজি এক সংসারে পড়বো এই মনে করে—"।

"রেখে দাও তোমার পিসি ভাইজি" রুক্ষগলায় পুষ্পেন্দু বলে উঠলো, "এক বংশের মেয়ে হতে পার্ব্বো তোমরা, কিন্তু এ কথা কী ভুলে গেছ, পিসি ছিল চল্লিশ টাকা মাইনের গরীব কেরাণীর মেয়ে—; আর ভাইজি তার ইওরোপ ফেরতা ধনী বাপের মেয়ে—"

"তা বাপু আমি কী বলছি—পুনু যেয়ে আমাদের সেই পল্লীগ্রামে

থাকবে? পাঁচু তোকে বিলাত পাঠাবে, চকরী করে দেবে, মটরগাড়ী, বাড়ী—"

খুড়িমার এই সব কথা শোনার মত পুষ্পেন্দুর মনের ধৈর্য তখন ছিল না। ও নীরবে পাঞ্জাবীটা গায়ে চড়িয়ে, চটীজোড়া পায়ে ঢুকিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। আজ ওর বিস্তর কাজ, যার সাথে এবং যেমন করে হোক্ খুড়ীমাকে সন্ধ্যের ট্রেণে বাড়ী পাঠাতেই হবে; ও যাবে কয়েকদিন পর। কারণ মাসের এখন শেষদিক্ চল্‌ছে—, যাদের বাড়ী প্রাইভেট টিউটরী করে, ও মাসের প্রথমে সেখানে বেতন পাবে, কাজেই এ ক'টা দিন তাকে অপেক্ষা করতেই হবে। এখন যেয়ে সে তার ছাত্র ছাত্রীকে এ খবর জানাবে।

* * * *

পূর্ণিমা কয়েকদিন ধরে ক্রমান্বয়ে ভেবে পুষ্পেন্দুর আকাশে যে স্তূপীকৃত মেঘগুলি সঞ্চারিত হয়েছিল, তা অপসারিত করবার যেন একটু পথ পেলো। অন্ততঃপক্ষে পুষ্পেন্দু যদি বি-এ পরীক্ষা পর্যন্ত ওদের বাড়ী থাকৃতে পারে, তা'হলে বি-এটা পাশ করতে পার্‌লে ও যেমন করে হোক্ জীবনের একটু আলো হয়তো বা দেখ্‌তে পাবে। জীবনটাকে কোনওপ্রকারে চালিয়ে নিতে পারবে। এই কথা মনে করে ও সঙ্কল্প কর্‌লো, যেমন করে হোক্ জননীর কঠিন চিত্তখানি জয় করবেই। ও পথ চল্‌বার ধারা একেবারে বিপরীত মুখে ফিরিয়ে দিল, জীবনের উদ্দেশ্যকে ঘুম পাড়িয়ে ফেল্‌লো। যেমন করে ঠিক সকাল বেলার কিশলয় ফুলটী আচমকা দম্‌কা বাতাসে ঝরে পড়ে, ঠিক তেমনি করে ওর মনের কাননের আশাতরুটীতে যে কল্পনার

মুকুলগুলি ফুটেছিল, সেগুলিকে অকালে ঝরিয়ে দিলো, জীবনের ভোরবেলা যে ব্রত গ্রহণ করেছিল তার পূজার্চনা সমাপন করলো। ও যেন সন্ত নেমেছে বিলেতের জাহাজ থেকে, এমনই আচরণ, এমন রুচিপ্রিয়তা ওর বেশ-ভূষায় চাল-চলনে মূর্ত হয়ে উঠলো। আরমী নেভি স্টোর থেকে সাজ-পোষাক অনেক কিছু কিন্‌লো, হোয়াইটওয়ে থেকে নিলে শাড়ী, চৌরঙ্গীর এক হেয়ার ড্রেসিঙে যেয়ে কালো কুচকুচে সুন্দর চুলগুলি বাব্‌ড করে এল। টি-পার্টি, ডিনার-পার্টি প্রভৃতি উৎসবে সমভাবে যোগদান করলো।

মা, বাপ ওর এ আকস্মিক পরিবর্তন দেখে নিবিড় খুসীতে উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন, ভাবলেন, "ভূত এবার মেয়ের কাঁধ থেকে নেমে গিয়েছে। বাপ ওকে একখানা বেবী অষ্টিন "কার" কিনে দিলেন, আর দিলেন রূপোর প্লেট করা বাক্সভরে একরাশ চকোলেট আর একখানি ব্রোকেড শাড়ী।

এই অবসরে পূর্ণিমা ওর গোপন বাসনাটী মা, বাপের কাছে প্রকাশ করে ফেল্‌লো। ওর এই কথা শুনে ভাসুদম্পতীর মুখ ক্ষণিক বিবর্ণ হয়ে উঠলেও, তাঁরা মেয়ের অনুরোধ রক্ষা করলেন এবং সঙ্কল্প করলেন, পুষ্পেন্দু যে কয়েকমাস আর থাকবে সে সময়টা তাঁরা সাগরপারে একবার ট্যুর করে আসবেন। কারণ ওই পুষ্পই যে পূর্ণিমাকে উৎসন্নের পথে নিয়ে যাচ্ছে যে বিষয় তাঁদের মনে আর কোনরূপ অবিশ্বাস ছিল না। উপরন্তু তার খুড়ী এসে নূতন এক ফ্যাকড়া বের করেছে।

* * * *

পুষ্পেন্দুর বাড়ী ফেরবার আর দিন দুই বাকী। এর মধ্যে একদিন সন্ধ্যাবেলা পূর্ণিমা যেয়ে ওর ঘরে উপস্থিত হোল। ও দেখ্‌লো তখন,

পুষ্পেন্দুর বিছানাপত্র বাঁধা হয়ে গিয়েছে, সে মুখ নীচু করে বসে টিনের সুটকেশ গুছোচ্ছে। বিস্ময়ে প্রায় ভেঙ্গে পড়ে সে বলে উঠলো—, "একী পুষ্পদা তুমি চলে যাচ্ছো নাকি? না-না সে হবে না, কিছুতেই হবে না, অন্ততঃপক্ষে পরীক্ষা পর্যন্ত তোমায় থাক্‌তেই হবে—, আমি বাবা, মা'র কাছে অনুমতি আদায় করেছি যে—"

পুষ্পেন্দু ওর কথায় চোখ তুলে কিছুক্ষণ তার নূতন ধরণের সাজ-সজ্জার পানে তাকিয়ে রইলো, তারপর ম্লান অধরে একটু ফিকে হেসে বল্‌লো, "কেন বেবী আমার জন্য তুমি নিজের সঙ্গে এমন প্রবঞ্চনা করছো, হীন করে তুল্‌ছো? ছিঃ ছিঃ ওসব বিলিতি সাজসজ্জা ছেড়ে দাও তুমি। মেয়েদের সত্যকার সৌন্দর্য যে কালো সুন্দর চুল তাই তুমি ছেঁটে ফেল্‌লে? কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে পুষ্পেন্দু কপালের ঘামগুলো মুছে ফেলে আবার বল্‌লো—, কিন্তু জানো তুমি, তোমার এ অফুরন্ত স্নেহের মর্যাদা আমি আর রাখতে পারছি না, আমার আর এখানে থাকা হবে না। এই দেখো, আমার বাবার চিঠি এসেছে, আমাদের জমীজমা যা কিছু ছিল সব নীলামে উঠে গেছে, পড়া আমার হবে না, তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে গিয়ে, আমাদের জমীদারের ষ্টেটে একটা কুড়ি টাকা মাইনের চাকরী খালি আছে, সেইটে গ্রহণ করতে হবে—, তা না হলে আমার মা, বাপ, ভাই, বোন অনাহারে মরে যাবে—"

এ কথার পর পূর্ণিমা কিছুক্ষণ কথা বল্‌তে পারলো না, ওর কণ্ঠস্বর তখন নির্বাক যেন অনড় হয়ে গেছলো। ও কল্পনা করতে পারেনি ওর আশা যে এমনই করে নির্মূল হয়ে যাবে।

ওকে নীরব দেখে পুষ্পেন্দু বল্‌লে—, "কথা বলছোনা যে বেবী, তোমার

কষ্ট আমি অন্তঃকরণে পরিষ্কার অনুভব কর্‌ছি—, কিন্তু আমার দ্বারা তার প্রতিবিধান একেবারে অসম্ভব যে—”

রুদ্ধ গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে পূর্ণিমা বল্‌লো—, “কষ্ট আর কী পুষ্পদা—, ভাবছি শুধু এই কথা সত্যি তুমি আর পড়বে না ? এমনি করে এই মাঝপথে তোমার সুন্দর ভবিষ্যতের সাজানো সুন্দর রচনাগুলি অকাল-ব্যর্থতায় পূর্ণ হয়ে উঠবে—, এরই মধ্যে পথের আলো ম্লান হয়ে উঠবে, নিভে যাবে—” ?

“এ ছাড়া আর উপায় কী বল বোনটী” পুষ্পেন্দু বল্‌লো—, “এই তো আমাদের গরীবের ছেলের ভাগ্যলিপি : একেই তো বলে আমাদের প্রকৃত পথচলা, এর বেশী কি আমরা আশা করতে পারি ? না আমাদের সাজে বসে বসে নিছক কল্পনার মালা গেঁথে চলা—”

“মিসিবাবা, মেমসাব্‌ আপ্‌কো বোলায়ে, আভ্‌ভি কেবেল আয়া, বালিষ্টর সাব আয়েঙ্গে আপ্‌কো টিসন যানে হোগা—” আজকে বিদায় মুহূর্তে বুঝি পুষ্পেন্দুর প্রাণের তট কত কথা বলার উৎসে ভেঙ্গে পড়েছিল, ওকে থামিয়ে দিয়ে পূর্ণিমার নেপালী আয়া এসে ঘরে প্রবেশ করলো।

ওর দিকে তাকিয়ে ভ্রূদুটী কুঞ্চিত করে পূর্ণিমা জিজ্ঞেস করলো—, “কে ব্যারিষ্টার সাব্‌ আসবে আয়া” ?

মুখ টিপে মৃদু হেসে আয়া বল্‌লো—, “অজিৎ সাব”

“তিনি ফিরবেন এখন” ? নিদারুণ আশ্চর্যের কণ্ঠে পূর্ণিমা বল্‌লো—, “তাঁর তো কোর্স শেষ হতে এখনও দুই বৎসর বাকী আছে—”

আয়া বল্‌লো—, “সাহেব, মেমসাহেব গল্প করছিলেন শুনলুম তিনি নাকি•

কয়েকদিনের জন্য উড়ো জাহাজে চড়ে বেড়াতে আসবেন, তাই কাল সকালে আপনাকে দমদম্ যেতে হবে"।

"তার আমি দম্দম্ গিয়ে কী করবো—, না জানি আদব-কায়দা, না পারি ইংরিজি কথা বল্‌তে—" এই পর্যন্ত বলেই মুহূর্তে পূর্ণিমা ওর বিক্ষিপ্ত মনটাকে শান্ত ও সংযত করলো। সে যে বাপ মা'র কাছে চিরকৃতজ্ঞতার জালে আবদ্ধ হয়েছে, সে তাঁদের বাধ্য হবে, তাঁদের সুখী করবে, তাঁদের আদেশ অমান্য করবে না—, তবে—?

ওকে নীরব দেখে পুষ্পেন্দু বললো—, "দাঁড়িয়ে রইলে কেন পূর্ণিমা? এই তো তোমার পথ চলার সত্য ধারা; একেই অনুসরণ করে তোমায় যে পথ চলতে হবে। প্রত্যেক মানুষেরই জীবনে পথ চলবার ধারায় একটা নিজস্ব উদ্দেশ্য নিহিত থাকেই—, কিন্তু কয়জন বল সে উদ্দেশ্যকে সার্থক করে তুলতে পারে? অনেকেই এমনই করে ব্যর্থ উদ্দেশ্যের বোঝা ঘাড়ে করে সংসারপ্রাঙ্গণে পথ চলতে হয়। পূরোণো দিনের স্মৃতি মনে করে এই কথাই ভাব্‌তে হয়, স্বপ্ন দেখেছিলুম ঘুমের ঘোরে, প্রভাতের আলোয় সে স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে—"

এই সময় চাকর এসে ঘরে ঢুক্‌লো, ওর জিনিষপত্রগুলো তুলে নিয়ে জানালো—, "রিক্সা ডেকে এনেছে"

ভৃত্যের হাতের বেডিং এবং টিনের চটা ওঠা সুটকেশটার দিকে পূর্ণিমা জলভরা চোখে একবার তাকিয়ে মুহূর্তে আয়াকে অনুসরণ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পুষ্পেন্দু একটী ভারী নিশ্বাস বুকের তলে চেপে রেখে, ভিজে চোখদুটী রুমালে মুছে ফেলে ওর গমন গতির দিকে তাকিয়ে রইলো। হয়তো বা

সে তখন ভাব্ছিল, "আচ্ছা বেবী কি কোনওদিন ওর দেহের ও মনের উপর থেকে ওই আবরণখানি খসিয়ে ফেলতে চঞ্চল হয়ে উঠবে না" ?

ভৃত্য বললো—, "বাবু রিক্সা হাঁকাহাঁকি করছে যে—"

"এই যে চল যাচ্ছি" পুষ্পেন্দু এবারে উঠে দাঁড়ালো।

দান প্রতিদান

ছোট্ট একখানি চিঠি—, তাই যেন রেডিওর বিখ্যাত গায়িকা কুমারী চন্দ্রা চৌধুরীর সব প্রোগ্রামকে ওলোট পালট করে দিল। দেয়ালের ঘড়িটায় যেন আজ রেশ খেলবার দিন, লাফিয়ে লাফিয়ে চল্‌ছে—এরই মধ্যে গেল পাঁচটা বেজে—; অথচ আজ্‌কে চন্দ্রার কাজের সীমা সংখ্যা নেই।

বোধনের গান তাকেই গাইতে হবে, কিন্তু বাজনায় একটীবারও বস্‌তে পারলো না, কয়দিন থেকে শ্রাবণের বৃষ্টির মত প্রেজেণ্ট আস্‌তে সুরু করেছে, তার রিটার্ণ দিতে একটা পার্টির ব্যবস্থা করতে হবে, অথচ কি যে মার্কেটিং করবে তার একটা লিষ্টই তৈরী হোল না। এইমাত্র ফোনে মিঃ বসু বল্‌লেন—, "তাড়াতাড়ি যা কিন্‌তে হবে তার ফর্দ তৈরী করে ফেলতে, এখুনি তিনি তাঁর "কার" নিয়ে আসছেন"; আজ তাঁর কলেজ বন্ধ হোল, বেচারী কলেজের ফেরতা একবার এসে ঘুরে গিয়েছেন। মিঃ বসু কলিকাতার নামকরা এক কলেজের ইংলিসের লেকচারার এবং চন্দ্রার গানের একজন অন্যতম মুগ্ধ শ্রোতা। ল্যান্সডাউন রোডে একটা ফ্ল্যাটে চন্দ্রা থাকে ওর বাপের সঙ্গে—, বাপ ই-বি রেলের রিটায়ার্ড চিফ মেডিক্যাল অফিসার, অতিরিক্ত বুড়ো হয়েছেন, স্ত্রী বিয়োগের পর থেকে মদের মাত্রাটা বেড়েই চলেছে বলে চন্দ্রা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে ভয় পায়।

সঙ্গোপনে

চন্দ্রা নিজের ঘরে একখানা সোফায় বসেছিল, ওর পাশে একখানা প্রকাণ্ড মেহগনি পালিশের টেবলের উপর স্তূপীকৃত নানা বর্ণের, নানা ছন্দের শাড়ী, ব্লাউস, ব্লাউসের পিস, ভেলভেট, জরি, সাবান, পাউডার, সেণ্ট, ক্রীম, রুমাল, এমনিতর কত কি জমে উঠেছে। এগুলি ওর গানের ভক্ত বন্ধু বান্ধবরা প্রেজেণ্ট করেছে।

ওর সুমুখে ছোট একখানি টিপয়ের পরে রয়েছে, রাইটিং প্যাড, পেন্ আর রয়েছে যে চিঠিখানা ওর নদীর জোয়ারে এনেছে ভাটা। এলোমেলোভাবে সেই চিঠিখানা পড়ে রয়েছে।

ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে চন্দ্রা ওর কলম তুলে নিল, ফর্দখানা শেষ করবে বলে—

সেভিং সেট—(বিকাশ সেন)

রুমাল এক ডজন—(কৌশিক সাণ্ডেল)

মুগা পিশ—(কুমার সুখদারঞ্জন)

রোল্ড গোল্ড হাতের স্লিভ—(ডক্টর মিত্র)

টাই, মোজা, দুটিন সিগ্রেট—(রায় বাহাদুর পলাশ মজুমদার)

এই পর্যন্ত লিখে চন্দ্রার পেন আর কোনও মতেই চল্‌তে চাইলো না, অথচ এখনও ওকে লিখ্‌তে হবে, ডজন দু'এক নাম। দূর হোকগে ও আর পারবে না রিটার্ণ ফিটার্ণ দিতে, যার খুসী হয় সে নিয়ে যাক্ তাদের জিনিষগুলো ফিরিয়ে। এ এক হাড়-জ্বলানো সভ্যতার চরম যেন। কলমটা রেখে দিয়ে চন্দ্রা চিঠিখানা তুলে নিল।

চিঠি লিখেছে ওর এক কলেজের বান্ধবী দীপ্তিমা মৈত্র। ওরই সমজুটী সে, বয়স ত্রিশের কোঠায় চলছে, অনেকদিন বিয়ে হয়েছে,'

সম্প্রতি ওর সাধব্য ঘুচেছে, তারই এক নবতর কাহিনী বান্ধবীকে শুনিয়েছে। সকাল থেকে চন্দ্রা বোধহয় বার পাঁচেক এই চিঠিখানা পড়েছে, তবু ওর পাঠস্পৃহা মেটেনি, আবার ও পড়তে সুরু করলো,—

প্রিয় চন্দ্রা—

যেদিন কাগজে তোর ছবিটা দেখি, তোকে ভীষণ হিংসে করতে ইচ্ছে করছিল। পনেরো বছরের ছুঁড়ীটির মত কেমন করে রয়েছিস্ বল্‌তো? তুই সার্থক। তোর নামের আগে লেখা কুমারীটার পানে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলুম, মনে হোল তুই যে কারও উচ্ছিষ্ট ন'স্ এই কথাটাই জোর করে প্রচার করতে চাইছিস্—সত্য করে বল্‌তো চন্দ্রা এটা একটা দুর্বলতার নামান্তর নয় কি? অথচ কি আশ্চর্য এইখানেই মানুষের মনের বিচিত্রতা; শোঁখা ফুল সবাই শুঁখতে ভালোবাসে। রেডিও ষ্টেশনে ওই যে দুটী ছেলের সঙ্গে তুই গান করছিস্—ওদের একটিকে বিয়ে কর্‌না—রঞ্জিত ছেলেটী বেশ কিন্তু—, তবে নির্মাল্যকেই তোর সঙ্গে মানাবে। অবিশ্যি ওরা যদি সম্মত হয়—কেননা, বিয়ে আর প্রেমের পার্থক্য যে কত সে কথা যারা জানে—তারা আর কেউ সখ্ করে ত্রিশ বছরের বুড়ীকে বিয়ে করবে না। পুরুষরা যতই বয়সের উপরি কোঠায় উঠুক না কেন, ওরা চিরকাল ষোল বছরের তরুণীকে বিয়ে করতে চায়। মোট কথা তুই আছিস বেশ, রথ দেখা কলা বেচা দুই চলে, অথচ কোনও ঝঞ্ঝা তোকে স্পর্শ করতে পারে না। আমার কথা শুনবি—বাবা অনেক দেখে শুনে অনেক বড় ঘরে বিয়ে দিয়েছিলেন—, কিন্তু স্নেহ-ভালবাসা সবের শীর্ষে যে ভাগ্যেরই স্থান, আমার অদৃষ্টই সে কথা প্রত্যক্ষ প্রমাণ

করছে। তুই জানিস্‌নে বোধহয় আমার বিয়ের কয়বছর পর আমার স্বামী হয়েছিলেন রাজনৈতিক বন্দী—, জেলেতেই ভুগছিলেন, মুক্তি পেয়ে হঠাৎ হার্টফেল করলেন। ডাক্তার বল্‌লেন, "সুখের উত্তেজনায় এই রকম ঘটলো"। কয়মাস হোল দাদার আশ্রয়ে ফিরে এসেছি—, স্বাবলম্বী হতে চাইলুম, কিন্তু শ্বশুর ও বাপের দুই কূলের সম্ভ্রমে ঘা পড়বে বলে দাদা বৌদির চরণবন্দনা করে দিন কাটিয়ে দিচ্ছি।

তবু ভাই তাঁদের মন পাইনে—, এই তো তোকে চিঠি লিখছি, আর শুন্‌ছি পাশের ঘরে দাদা বৌদির তুমুল সংঘর্ষ বেধেছে, তোর এই হতভাগা বন্ধুনীই সে দ্বন্দ্বের উপলক্ষ। পূজোর ফর্দ লিখেছেন বৌদি ; কিন্তু আমার নাম সে তালিকায় বাদ পড়েছে—, তাই দাদা বলছেন "কই দীপ্তির জন্য একটা কিছু লেখা হয়নি তো রেবা—" ? "কুলোয় কই নিজে হাতে করে দেখইনা কেন", বৌদি বললেন, "পূজা স্পেশাল গাড়ীতে এবছর চুড়ী জোড়াটা বদলাতেই হবে, বেনারস থেকে কাশ্মীর সিল্ক আনিয়েছি, দর্জি মিণু আর রমার ফ্রক আন্‌বে, তার দাম দিতে হবে। জামাইবাবু উইদাউট পে-তে রোগে ভুগ্‌ছে—দিদির ছেলেমেয়েদের কিছু পাঠানো তোমারও একটা কর্তব্য আছে—"

"আর আমার বিধবা বোনটাকে একটা "থান" দেওয়া আমার কর্ত্তব্য নয় বুঝি—" দাদার শ্লেষের কণ্ঠ ভেসে এল কানে, আর এল ক্যাশবাক্স মেঝেয় পড়ে গেল, তারই শব্দ—টাকাগুলো ছড়িয়ে গেল তার ঝম্‌ঝমানি, বৌদির গোঙানি।

জানিস্ ভাই মাথাটা আমি তুল্‌তে পারছিনে, যেন কি লজ্জায় কি

ঘেন্নার বিধবা মেয়েমানুষের জীবন—; শুধু একখানা থান তাই নিয়ে এত দ্বন্দ্ব, এত কলহ? এর কি কোনও প্রতিবিধান নেই?

আজকে বোধহয় অফিস, স্কুল, কলেজ বন্ধ হোল, পথ ঘাট ব্যস্ত মুখরিত, ছেলেদের, বাবুদের চঞ্চলতায়; ট্রেণ ধরতে পারবে না বলে ওদের এত তাড়া, সবারই হাতে রঙিন সুতো দিয়ে বাঁধা কিছু না কিছু মোড়ক রয়েছে।

ঠিক এমনি করেই বছর পাঁচেক আগে একদিন আমার স্বামীও আমার ঠোঁটের মিষ্টি হাসিটি দেখতে বাজারশুদ্ধ যেন উজাড় করে এনেছিলেন। যেদিন আমি কমপক্ষে তিনখানি দামী সাড়ী নিয়ে তাঁর হাতে মুক্তি পেয়েছিলুম। আর আজ শুধু একখানা থান—, তাই নিয়ে এত দ্বন্দ্ব; সেদিনে আর আজকে কত তফাৎ ভাবতেও আশ্চর্য লাগে।

ওদিকে সরকারী ডাক্তার, প্রবীণ, ঘোষ সাহেবের বাড়ী নীরব ব্যথার এক ফল্গুধারা যেন বয়ে যাচ্ছে।

ডাক্তারবাবু তাঁদের হসপিটালের নার্সকে একখানা দামী সাড়ী প্রেজেণ্ট করেছেন, অবিশ্যি অত্যন্ত গোপনেই তিনি এ কাজটি করেছিলেন, তবু কথাটা যেন কিভাবে প্রচার হয়ে গিয়েছে, তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী তো আজ তিনদিন অন্ন স্পর্শ করেননি—"

এই পর্যন্ত চন্দ্রা চিঠিখানা পড়েছে, এমনই সময় ওর পাশের ফ্ল্যাট থেকে ভেসে এল একটা গোলমাল, চন্দ্রা কাণ পেতে শুনলো ওদের নূতন বউটি বলছে, "তত্ত্ব দিতে হবে বলে তো আমার বাবা দাসখত লিখে দেননি, তোমাদের গুষ্টিশুদ্ধর জন্যে বাজার করে দিতে হবে—"

চন্দ্রা শুন্‌তে পেলো চাপা গলায় বউটীর স্বামী বলছে, "ছিঃ রেখা, শ্বশুর শাশুড়ীর সঙ্গে অমন করে কথা বল্‌তে নেই—"

"বল্‌তে নেই কি রকম, রুখে উঠে রেখা বল্‌লো—"তোমাদের সে যুগ আর এখন নেই, তত্ত্ব নিয়ে শ্বশুর শাশুড়ী বউকে নাকের আর চোখের জলে এক করবে আর বউ তাই মেনে নেবে, নিতে হয় নাও, ফেরৎ দিতে হয় দাও, আমি চললেম, দুর্গা ফিল্ম কোম্পানী থেকে আমায় সাধাসাধি কর্‌ছে"।

চন্দ্রা স্পষ্ট শুন্‌তে পেলো, চটীর চটপট শব্দ সিঁড়ির দিকে মিলিয়ে গেল।

"হোপলেশ—ডারলিং তুমি এখনও বসে? যাবেনা মার্কেটিং করতে? ও—মাই এখনও লিষ্ট শেষ হয়নি, সেই চিঠিখানা পড়ছো—"? বেগম মমতাজ যেমন করে যেতেন সম্রাট সাজাহানের সান্নিধ্যে, ঠিক তেমনি করে প্রফেসার বসু স্ফীতবক্ষে বসলেন এসে চন্দ্রার একান্ত পাশটিতে স্তরে স্তরে সাজানো চন্দ্রার উপহার সঞ্চিত দ্রব্যসম্ভারগুলির পানে একবার বিষ-নয়নে তাকিয়ে দেখলেন, মনের গভীর প্রান্তে ভাবলেন, "সম্রাট সাজাহানের বেগম ছিল অসংখ্য কিন্তু মমতাজ ছিলেন যেমন তাঁর পেয়ারী বিবি, ঠিক তেমনি "সাজাহান চন্দ্রার" পাশে আমার স্থানে যে সবের শীর্ষে একথা সবাই জানে, সবাই মানে।" কথাটী কিঞ্চিত সত্য, সবাই না মানুক্ অন্ততঃপক্ষে প্রফেসর বসু তাই বিশ্বাস করেন, সেইজন্যই তিনি তাঁর স্পেশালিটি জাহির করতে, চন্দ্রা তাঁর কাছে শুধু মোটারখানা চেয়েছিল মার্কেট করবে বলে, তিনিই কিনে সব দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কেননা তিনি জানেন মেয়েদের মন জয় করতে হলে একটু উদারতা দেখাতে হয়।

সঙ্গোপনে

কুমারী চন্দ্রা প্রফেসর বোসের কাঁধের উপর মাথাটা রেখে সকরুণ স্বরে বললো,—"না, মিঃ বসু লিষ্ট তৈরী করতে কিছুতে পারছিনে, ওই দীপ্তিমার চিঠিখানা বড় উৎপাত করছে, আপনাকে তো দুপুরবেলা ওই চিঠির শেষটুকু শুনিয়েছি,—কি মনে হচ্ছে জানেন, ওই যে আমার ঘর স্তূপীকৃত উপহারে ভরে উঠেছে, ওর ভেতরে না জানি কত দীর্ঘশ্বাস, কত অশ্রুজলের কাহিনী—"

"আছেই তো জমানো"—প্রফেসর বোস বলে উঠলেন "ফেরৎ দিয়ে দাওনা সব ঝঞ্ঝাট মিটে যাবে।"

"তাহলে হীরের ঝুমকোটাও ফেরৎ দিতে হয় আপনাকে—"

"কেন তোমাকে একজোড়া হীরের ঝুমকো দেবার মত আমার যথেষ্ট সমর্থ আছে চন্দ্রা"।

"কিন্তু দুপুরবেলা আপনার পকেট থেকে একটা চিঠি পড়ে গেছলো তাইতে জানলুম টাকার অভাবেই নাকি এবার আপনাদের দুর্গোৎসব উঠে যাচ্ছে—, পল্লীগ্রামে একশ টাকায় বেশ হেসে-খেলে মহামায়ার অর্চনা হতে পারে, তাই নয় কি মিঃ বোস"?

"হেঁ হেঁ, না না, তা বটে—" মিঃ বসু তাঁর বিরাট বপু দুলিয়ে টেনে টেনে হাসতে হাসতে কি বলবেন ভাবছিলেন—, এমনই সময় ঘরে প্রবেশ করলো নির্মাল্য লাহিড়ী, সেও একজন রেডিওর বিখ্যাত সুরশিল্পী; হাতে ছিল সুন্দর একটি ফুলের গুচ্ছ, সেটী চন্দ্রার হাতে দিয়ে বললো—"আপনার এ দামী সুন্দর সুন্দর উপহারের পাশে আমার এ সামান্য ফুল ম্লান হয়ে যাবে জানি চন্দ্রা—তবু তুমি জানো নিশ্চয়ই সমর্থ এর বেশী—" প্রায় লাফিয়ে উঠে চন্দ্রা গোলাপ ফুলের পাপড়ীতে ওর পাতলা ঠোট দুটি স্পর্শ করে

উৎসাহের কণ্ঠে বল্‌লো—আজকের আমাদের এই দান প্রতিদানের অনুষ্ঠানে তুমিই কিন্তু জয়ী নির্মাল্য, এ ফুলে নেই কারও দীর্ঘশ্বাস, নেই কারও অশ্রুজল, বাগানে ফুটেছিল ফুল—"

নাও চন্দ্রা এখন রাখো তোমার কবিত্ব স্মিতহাস্যে নির্মাল্য বল্‌লো—"স' আটটায় তোমাকে যেতে হবে রেডিও ষ্টেশনে, ম্যানেজারের বিশেষ অনুরোধ তোমাকেই আজকের মহলার উৎসব সুরু করতে হবে, কুমারী ইরা সেনের অসুখ, তাই প্রোগ্রাম চেঞ্জ করতে হোল।"

"স' আটটা টাইম তো খুব সর্ট, প্রফেসর বসুর দিকে তাকিয়ে চন্দ্রা বল্‌লো" কিছু মনে করবেন না মিঃ বসু—আপনার "কার"খানা কিছুক্ষণের জন্যে নিচ্ছি ; ইচ্ছে করলে আপনিও আমার গান শুন্‌তে পারবেন, ওঘরে রেডিও সেট আছে। প্রফেসর বোসকে কিছু বল্‌বার অবসর না দিয়ে চন্দ্রা নির্মাল্যর কাঁধের উপর হাত রেখে ঘর হতে বার হয়ে গেল।

মোটরে বসে শুনতে পেলো মিঃ বসু বল্‌ছেন, "পেট্রোল, নেই কিন্তু—" "কিছু হবে না, কিনে নেব", চন্দ্রা বল্‌লে গাড়ী থেকে মুখ বের করে দিয়ে।

প্রতীক্ষা

সেদিন বুঝি শারদীয়া-উৎসবের শুক্লা-অষ্টমী তিথি। সকালবেলা মিনু ওর ঘরের জান্‌লায় চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। নববধূ সলাজ চঞ্চল চকিত চোখের ছায়ায় ওর প্রতীক্ষার একটা স্তিমিত, উজ্জ্বল দীপ্তি ফুটে উঠেছে। ওদের ছোট্ট সংসারে একমাত্র শ্বাশুড়ী আর সে। শুভেন্দু কোল্‌কাতায় স্কুল মাষ্টারী করে, অবসরটুকু ছেলেমেয়ে পড়ায়—সুতরাং বাঙালীর সংসারে পুরুষ মানুষেরই হাঁকডাক নেই যখন, তখন মেয়েদেরও কাজকর্মের অত জাঁকজমক নেই। তার উপর আজ আবার দেবী-অর্চনার প্রধান তিথি মহাষ্টমী—পূজা-পার্বণ উপবাস ইত্যাদি অনুষ্ঠানের নিয়ম পালনে সংসারের ঢিলে গতি আরও শিথিল হয়েছে। মিনুরও কাজকর্মের কোন বালাই নেই।

জান্‌লার বাইরে ছোট্ট উঠানে একটি শিউলি ফুলের গাছে একটি ছোট্ট ময়না পাখী এদিক্-ওদিক্ চাইছে বসে। মাঝে মাঝে ডেকে ডেকে উঠ্‌ছে। টুপটাপ ক'রে কত ফুল ওর গায়ে ঝরে পড়ছে সেদিকে দৃষ্টিও নেই। একটা উতলা চঞ্চল ভাব—বোধহয় সেও তারি প্রিয়জনেরই প্রতীক্ষা করছে—কেননা, মিনুও তখন শুভেন্দুর চিঠির অপেক্ষাতেই জান্‌লায় দাঁড়িয়েছিল। ওদের দু'জনেরই দৃষ্টির ব্যাকুলতা এক ধরণের।

বাঁশ এবং কলাবনের ঝাড় দিয়ে ঘেরা উঠানের ফাঁকা একাংশ দিয়ে দেখা যায় সড়কের যে পথটী গ্রামের প্রান্তে মিশে গিয়েছে, সেইদিকে মিনু

তাকিয়ে ছিল।—হ্যাঁ, ওই তো বলাইরাম চলে যাচ্ছে না? তাই তো, খাকি কোটের ছেঁড়া অংশটুকু পর্যন্ত ও তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। তবে নিশ্চয় ওঁর চিঠি নেই। প্রিয়জনের চিঠির ব্যর্থ প্রতীক্ষায় অনেকেরই বিরহী মনের ভিতর থেকে শুধু ঝরে পড়ে হয় তো একটা আতপ্ত নিশ্বাস, কিন্তু মিনুর নিশ্বাস একটুও উষ্ণ ছিল না—বেশ হাল্কা, স্নিগ্ধতায় প্রগাঢ়।

তার কারণ শুভেন্দু ওকে লিখেছিল "মিনু, মেসের পাঁচ মাসের ভাড়া বাকী পড়েছে। পূজোর মাস বলে একসঙ্গে চুকিয়ে দিতে হচ্ছে—তাই এখন আর বাড়ী যেতে পারছি না। তুমি যেন মন খারাপ করো না"।

এর উত্তরে মিনু লিখেছিল—"ওগো, না না সে হবে না, তোমার হাতের আংটীটা আছে তো, সেটা না হয় বাঁধা রেখে চলে এস। এ ক'টা দিন আমার একা কিছুতেই ভালো লাগ্বে না—আসবে তো ঠিক"?

শুভেন্দু লিখেছিল—"খুব চেষ্টা করবো যেতে—কিন্তু তুমি আশা রেখো না মিনু! নিতান্ত যদি না যেতে পারি, তবে চিঠি দিয়ে জানাব। সকালের ডাকে আমার চিঠি যদি না পাও, তবে আমি সন্ধ্যার গাড়ীতে ঠিক পৌঁছাব"।

তাই বুঝি ব্যর্থ চিঠির আশা মিনুর মনে একটা সুখের দোল দিয়ে গেল। পিওন গেছে চলে। ও আবার সন্ধ্যাবেলা এমনি উৎসুক প্রতীক্ষা নিয়ে জান্‌লায় দাঁড়িয়ে থাক্‌বে। যে প্রতীক্ষায় থাক্‌বে ওর প্রাণের দ্রুত স্পন্দন, ঔৎসুক্যের একটা উগ্র মদিরতা, আর রোমাঞ্চিত হৃদয়ের একটু ব্যাকুলতা, হয় তো বা—মিনু মনের মধ্যে বেশ একটা হর্ষের ঘনঘন কম্পন অনুভব করলো। 'সংসারে পুরুষ মানুষের হাঁকডাক নেই, কাজকর্মের গোছগাছ নেই।' মিনু ওর তক্তাপোষের কাছে এগিয়ে গিয়ে বিছানাগুলো উল্‌টে

পাল্‌টে দিয়ে ভাবলো—ইস্ কী সব বিশ্রী গন্ধ হয়েছে! রদ্দুরে না দিলে চল্‌বে না। মিনু সেগুলো তুলবে বলে গোছগাছ করতে লাগ্‌লো।

ঠিক তখন কোল্‌কাতায়—এণ্টালী অঞ্চলে একখানি ত্রিতল মেস—বাড়ীখানা প্রায় জনশূন্য নীরব, অধিকাংশ মেম্বার বাড়ী চলে গেছে, শুধু একতলায় একখানা ঘরে শুভেন্দু বসে—ওর হাতে রয়েছে মিনুর চিঠিখানা। মিনু লিখেছে—"আংটী বাঁধা রেখে তুমি এস"।

শুভেন্দুর মুখে একটুখানি শ্লেষমিশ্রিত বেদনার হাসি ফুটে উঠলো। ও ভাবলো—মিনু একেবারে দরিদ্রের সংসার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, গরীবের ঘরের টাকা-পয়সা সোনার চিহ্নটুকু পর্যন্ত যে মা-লক্ষ্মীর কলঙ্ক, অপমানের বস্তু, সে কথা কি ও জানে না? তাই না সেবাব জমী দারের খাজনা দিতে আংটীটা বিক্রী করেই ওকে টাকা পাঠাতে হয়েছিল। তবু এই যা' রক্ষে, ঈশ্বর ওর প্রতি একটু সদয় বল্‌তেই হবে—তা' না হ'লে পাঁচ মাসের ঘর ভাড়া বাকী—এ মাসে দেবার কথা—সরকার-মশায় এখনও এলেন না কেন? তিনি নিশ্চয়ই ভেবেছেন—পূজোয় মেসের মেম্বাররা সব বাড়ী চলে গিয়েছে। এবার প্রাণের তল থেকে একটু সুখের হাসি শুভেন্দুর অধরের এক কোণে বিকশিত হয়ে উঠলো। তা'হলে ঐ পঁচিশটা টাকা নিয়ে ও সন্ধ্যাবেলা বাড়ী পৌঁছুতে পারবে। ছুটোর সময় গাড়ী। এই সময় একবার বেরিয়ে মিনুর একটা শাড়ী মায়ের একখানা থান ধুতি কিনে নিলে চল্‌বে।

—"শুভেন্দুবাবু, ও শুভেন্দুবাবু বাড়ী আছেন নাকি"? ঠিক্ সেই সময় মেসের ভাড়া নিতে সরকার-মশায় জীবন্ত প্রেতাত্মার মত শুভেন্দুর সুমুখে হঠাৎ যেন আবির্ভূত হলেন।

কয়েক মুহূর্ত বিবর্ণ মুখে তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে শুষ্ককণ্ঠে শুভেন্দু বল্‌লো—"আমি ভেবেছিলুম আপনি বুঝি এ মাসে আর আসবেন না" ?

—"সে কি হয় শুভেন্দুবাবু" ! সরকার-মশায় একটু ভদ্রতাসূচক হাসি হেসে বিনীত কণ্ঠে বল্‌লেন—"আপনি তো জানেন—এ অঞ্চলের বাড়ীগুলোর উপস্বত্বেই বাবুদের দুর্গাপূজোর খরচ-পত্র চলে। আমি জানি আপনি বাড়ী যাবেন না—তাই আপনাদের কয়েকজনের ভাড়া শেষ মুহূর্তে তুলবো বলে বাকী রেখেছিলুম"।

শুভেন্দু উঠে শুধু একটি ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বাক্স খুলে পঁচিশটী টাকা গুণে সরকার-মশায়ের হাতে দিয়ে দিল।

অনেকক্ষণ কেটে গিয়েছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক। শুভেন্দু ওর তক্তাপোষে অলসভাবে শুয়ে শিথিলভাবে একটা বিড়ি টানছিল। এক সময় উঠে পড়ে চিঠি লেখ্‌বার সরঞ্জামাদি বার করে এনে সে নিজের মনেই বল্‌লো—"না, এ ভাবে শুয়ে থাক্‌লে আর চল্‌বে না—মিনুকে একটা চিঠি লিখে খবরটা জানাতে হবে—তা' না হ'লে যে ট্রেণ দুর্ঘটনার ধুম পড়ে গিয়েছে, বাড়ীতে সবাই হয় তো উৎকণ্ঠিত হবে"। ও লিখ্‌লো মিনুকে—"স্নেহের মিনু, আজকে সন্ধ্যাবেলা অমার বাড়ী পৌছানোর কথা ছিল, কিন্তু বিধাতার অভিশাপ যেন এইমাত্র এসে আমার পথরোধ করে দাঁড়ালো—যাওয়া আর হোল, না। কাল পর্যন্ত বাড়ীওয়ালা ভাড়া না নিতে আসায় ঠিক্ করেছিলুম—ওই টাকা নিয়েই আমি বাড়ী যেতে পারবো—কিন্তু এইমাত্র মালিকের লোক এসে পাঁচ মাসের মেসভাড়া আদায় করে নিয়ে গেল। এই অঞ্চলের বাড়ীগুলোর উপস্বত্বেই তাঁদের দুর্গাপূজার

খরচ চলে। আংটী আমি অনেকদিন জমিদারের খাজনা দিতে বিক্রী করে দিয়েছি"।

এই পর্যন্ত লিখে হঠাৎ শুভেন্দুর মাথার মধ্যে একটা আগুন যেন দপ্ করে জ্বলে উঠলো। ও বালীগঞ্জ অঞ্চলে এক এটর্নীর ছেলেমেয়েকে পড়িয়ে কিছু টাকা উপার্জন করে। এ মাসের মাইনে ও এখনও পায়নি—এটর্ণী বলেছেন—"এ মাসে পূজোর বিস্তর খরচের জন্য মাষ্টার-মশায়কে কিছু দিতে পারছেন না—সামনের মাসে সব চুকিয়ে দেবেন"।

ভদ্রতাসূচক স্বভাবসুলভ সঙ্কোচের জন্য শুভেন্দুও তাগাদা দিতে পারেনি। এখন সে দাঁতের ফাঁকে কলমটা চেপে রেখে ভাব্লো—সেই বা কেন এত সকলের উপরোধ-অনুরোধ রক্ষা করে চল্বে? ওর কিসের সঙ্কোচ, কিসের কুণ্ঠা? ও স্পষ্ট কথা ব'লে টাকা আদায় ক্‌রে নেবে। সকলেরই দুর্গোৎসব—আর ওরই ভাগ্যে জুটবে শুধু ফাঁকির উৎসব।

ও মিনুকে আবার লিখ্‌লো—"তবে কী জানো, আমি যাঁদের বাড়ী প্রাইভেট পড়াই, তাঁরা পূজোর খরচের জন্য এ মাসের টাকা দিতে পারবেন না বলেছিলেন। আমি এখন যাচ্ছি তাঁদের বাড়ী টাকাগুলো আদায় করতে—যদি পাই, আজই রওনা হতে পারবো, আর যদি না পাই, তুমি আমার এ চিঠি কাল সকালবেলা পেয়ে সব কথা জান্‌তে পারবে"।

শুভেন্দু তাড়াতাড়ি চিঠিখানা শেষ ক'রে এটর্নীর বাড়ীর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো। তখন সাড়ে বারোটা বেজে গেছলো—আড়াইটের গাড়ী। যাবার আগে পাচক ঠাকুর এসে জিজ্ঞেস করলো—"বাবু খাওয়া-দাওয়া না ক'রে বেরুচ্ছেন যে"?

—"আজ আর আমি খাবো না—সম্ভবতঃ বাড়ী যেতে পারি।

তোমরা খেয়েদেয়ে নাও"। শুভেন্দু সদর অভিমুখে যেতে যেতে এই কথা বল্‌লো।

বালীগঞ্জ অঞ্চলে এটর্ণী মিঃ মজুমদারের ইংরেজী এবং বাঙ্‌লা দুই ফ্যাসানে মেলানো প্রকাণ্ড বাড়ী। শুভেন্দু গেটের ভিতর ঢুকে কাঁকর বিছানো পথ অতিক্রম ক'রে বারান্দায় উঠ্‌তেই দশ বছরের ছাত্র খোকনের সঙ্গে তার দেখা হোলো। মাষ্টার-মশায়কে দেখে সে ছুটে এগিয়ে আসতেই শুভেন্দু তাকে বল্‌লো—"শোনো খোকন, তোমার বাবাকে গিয়ে বলোগে—মাষ্টার-মশায়ের টাকার বিশেষ প্রয়োজন, তাই তিনি এ মাসের মাইনেটা চাইছেন"।

খোকন ছুটতে ছুটতে চলে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে বল্‌লো—"মাষ্টার-মশায়, বাবা বল্‌লেন—তিনি আপনাকে এ সম্বন্ধে যা' বলার ব'লে দিয়েছেন, এখন আপনি আর তাঁকে বিরক্ত করবেন না"।

—"বিরক্ত আর কী বলো! রুক্ষকণ্ঠে শুভেন্দু বল্‌লো—"পাওনা টাকা আমি আমার চাইছি। শোনো খোকন, তুমি আর একবার গিয়ে বলোগে আমার টাকার খুব দরকার"।

—"ওরে বাবা, আর আমি বল্‌তে পারবো না মাষ্টার-মশায়! বাবা এখন 'ব্রিজ' খেলছেন, এবার আমায় ঠিক্ মেরে ফেলে দেবেন"।—বলেই খোকন লাফ দিয়ে মুহূর্তে শুভেন্দুর দৃষ্টির সুমুখ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তা' না হয় যাক্ সে পালিয়ে। কিন্তু শুভেন্দু আজ মরিয়া হয়ে এয়েছে—ওর প্রাপ্য টাকা আজ ও আদায় করবেই। দাসদাসী সব ভিতর বাড়ীতেই। একজনের সন্ধানে ও আবার কাঁকর বিছানো পথে নেমে পড়লো।

সঙ্গোপনে

প্রায় মিনিট পনরো কুড়ি কেটে গেছে। শুভেন্দুর সঙ্গে যে কয়জন ভৃত্যবর্গের সাক্ষাৎ হয়েছিল, তারা কেউ ওর অনুরোধ রক্ষা করতে সম্মত হয়নি। মনিবের সান্নিধ্যে যেতে সকলেই আতঙ্কগ্রস্ত। শুভেন্দু কী করবে ভাবছে। ফিরে যাবে বলে একবার গেটের দিকে এগিয়ে গেল। ওর বিদ্রোহী মন আবার ওকে আতপ্ত করে তুল্‌লো। নিজেই দ্বিতলে এটর্ণী-সাহেবের কাছে যাবে বলে আবার গেটের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালো। এমন সময় বাগান থেকে একজন ভৃত্য বলে উঠলো—"বাবু, মাষ্টার-বাবু, সরে যান্, গাড়ী আস্‌ছে"।

আর তখন মাষ্টারবাবু সরে যান—এটর্ণী-সাহেবের গাড়ী ঘন ঘন হর্ণ দিতে দিতে গেটের মধ্যে প্রবেশ করলো। তার ধাক্কা খেয়ে টাল সামলাতে না পেরে শুভেন্দু পড়ে গেল এবং ড্রাইভার সাধ্যমত প্রয়াসে ব্রেকের সাহায্য গ্রহণ করলেও শুভেন্দু রীতিমত আঘাত পেলে। গাড়ীর আরোহিণী শুভেন্দুর কিশোরী ছাত্রী টুকুন ত্রাস্তে গাড়ী থেকে নেমে পড়লো। সে বাজার ক'রে ফিরছিল। তার হাতে শাড়ী, ব্লাউজ, জুতো প্রভৃতির বাক্স। সেগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে গেল। ও সম্বিতহারা শুভেন্দুর কাছে এগিয়ে গিয়ে নীচু হয়ে তার মুখের উপর ঝুঁকে থুতনিতে মৃদু ঝাঁকানি দিতে দিতে অত্যন্ত চঞ্চলভাবে বল্‌লো—"মাষ্টার-মশায়, ও মাষ্টার-মশায়, কথা বল্‌ছেন না কেন? আপনি কী গাড়ীর বাঁশী শুন্‌তে পান্‌নি"?

ড্রাইভার বল্‌লো—"দিদিমণি, ওঁর এখন জ্ঞান নেই—আমি বরফ আন্‌তে পাঠাচ্ছি"।

চম্‌কে উঠে টুকুন্ বল্‌লো—কি বল্‌লে ড্রাইভার, জ্ঞান নেই! তুমি এখনই এঁকে ঘরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর। আমি ডাক্তারবাবুকে

খবর দি"। টুকুন ঘরের ডাক্তারকে ডাকৃতে বারান্দায় গিয়ে 'রিসিভার'টা তুলে নিল।

পার্ক সার্কাস অঞ্চলের নবীন চিকিৎসক জয়ন্ত বাগ্‌চী টুকুনের সঙ্গে কথা ব'লে 'রিসিভার'টা নামিয়ে রাখতেই স্ত্রী পাপিয়া জিজ্ঞেস করলো— "আবার এখন বেরুতে হবে না কি তোমায়"?

—"হ্যাঁ পাপিয়া"। চিন্তিতমুখে জয়ন্ত বল্‌লে—"কেস সিরিয়াস। কাপড় জামাগুলো গুছিয়ে দাও তাড়াতাড়ি"।

বিরক্তিপূর্ণকণ্ঠে পাপিয়া বল্‌লো—"এই মাত্র তো তুমি ফিরলে, দশ মিনিটও হয়নি খেয়েছ, এখন কী না গেলেই চল্‌বে না? তা' ছাড়া, মীরাদি'দের ওখানে পূজোর নিমন্ত্রণ ছিল। ছুটোর পর বিশেস ক'রে যেতে ব'লে গিয়েছে"।

—"তা' তুমি ঘুরে এস না কেন? গাড়ী থাক্ বাড়ীতে, আমার ট্যাক্সীতেও গেলে চল্‌বে"।

—"না না, আমার গাড়ীতে দরকার নেই।" রুক্ষভাবে পাপিয়া ব'লে উঠ্‌ল—বন্ধুবাড়ী এমন একা একা ঘ্যান্‌ঘ্যান্ ক'রে গেলে মেয়েমানুষের সম্মানের হানি হয়"।

জয়ন্ত কোন উত্তর দিল না—কারণ, তখন তার কুরুক্ষেত্রের অবতারণার অবসর ছিল না। ও গিয়ে গাড়ীতে চড়ে বসল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে সে বাড়ী ফিরে দেখ্‌লো—পাপিয়া একটা মাদুরের উপর শাড়ী-ব্লাউজের স্তূপ বার ক'রে তোড়ঙ্গের মধ্যে গুছিয়ে তুল্‌ছে। চোখ দু'টী ওর অভিমানের অশ্রুজলে লাল টক্‌টক্ করছে, ফুলে

উঠেছে। জয়ন্ত ওর গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলো—সে অনেকক্ষণ কেঁদেছে। তারপরই এই বাক্স গোছানোর ধূম পড়ে গিয়েছে, নিশ্চয়ই পিত্রালয়ের যাবার আয়োজনে। জয়ন্ত অনাবশ্যক শব্দ ক'রে টেবিলের উপর এটা-ওটা রেখে ওর দৃষ্টি আকর্ষণের ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে হঠাৎ পকেট থেকে একখানা চিঠি বার করতে করতে ব'লে উঠল—"আহা; বেচারী নতুন বিয়ে করেছে, পয়সার অভাবে দেশে যেতে পারছিল না, তাগাদায় এসে গেলো কি না হাসপাতালে"!

পাপিয়া নিদারুণভাবে চমকে উঠলো। যে কণ্ঠস্বর ওর অভিমানের বাষ্পে অবরুদ্ধ হয়েছিল, একটি বিবাহিত যুবকের সম্বন্ধে এই করুণ কাহিনী শুনে তার গলাটা মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে গেল। আগ্রহের সঙ্গে স্বামীর হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে পড়ে উৎকণ্ঠামিশ্রিত ঔৎসুক্যের কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো—"এটা কোথায় পেলে"?

জয়ন্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো—"তারই পকেটে। এ আর তার পাঠান হয়নি"।

—"আঘাত কী তাঁর খুব লেগেছে? ভালো হবেন তো? তোমার কী মনে হয়"?

—"ভালো হবেন কি সে কথা এখন তো কিছু বলা যাচ্ছে না পাপিয়া! আঘাতটা মাথায় লেগেছে কী না। হাসপাতালে ভর্তি ক'রে দিয়ে এলুম—দেখা যাক্ কী হয়! বিকেলে গিয়ে একটু ভাল দেখলে তবেই এ চিঠিখানা পাঠিয়ে দেবো, নইলে"—একটা দীর্ঘনিশ্বাস সে প্রাণপণে রোধ করলে।

পাপিয়া চঞ্চলকণ্ঠে বললো—"আমায় নিয়ে চল না গো হাসপাতালে, আমি একবার দেখবো"। ত্রস্ত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে ও বললো।

—"চলো, তার আগে একবার তোমার মীরাদি'র ওখানটা ঘুরে যাই"।

—"তবে যাই আমি, কাপড়-চোপড় বদলে তোমার চা নিয়ে আসি। তুমিও ততক্ষণ তৈরী হয়ে নাও"।

বাগবাজার অঞ্চলে পাপিয়ার বন্ধু মীরাদের বনেদী বংশের পরিচয়স্বরূপ সেকেলে ধরণের তিনতলা প্রকাণ্ড বাড়ী। পাপিয়া এবং জয়ন্ত বাইরের মহল অতিক্রম ক'রে ভিতর মহলে পৌঁছুতেই—মীরা বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল —ছুটে এসে ওদের অভ্যর্থনা ক'রে দ্বিতলে নিয়ে যেতে যেতে মৃদু অনুযোগের সঙ্গে বল্‌লো—"বেশ মেয়ে তুমি যা' হোক্ পাপিয়া! এই বুঝি তোমার ত্রুটো? জয়ন্তবাবু, আসলে আপনি আমার বন্ধুটীকে এক মুহূর্ত ছেড়ে থাক্‌তে পারেন না—তাই নয় কী"?

জয়ন্ত বল্‌লো—"মীরাদেবী, সে কথা আপনি ওর কাছেই আমার আড়ালে জেনে নেবেন"।

নতমুখে সরমরাগরঞ্জিত ঠোঁটে একটু হেসে পাপিয়া সে কথা চাপা দেবার উদ্দেশ্যেই বল্‌লো—"এবার মীরাদি, পূজোয় কিন্তু খুব ধুম করেছ। বাইরে লোকে লোকারণ্য। বড় রাস্তা গাড়ীতে একেবারে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। উদয়শঙ্করের পার্টি এনেছ বুঝি? ওদিকে তার আয়োজন হচ্ছে দেখ্‌লুম"।

ওদের বসিয়ে সুমিষ্ট হেসে মীরা বললো—"কী আর করতে পেরেছি ভাই! ইচ্ছে অনেক কিছুই ছিল—তা' আমাদের এণ্টালী অঞ্চলের মেস-বাড়ীগুলোর ভাড়া আদায় আর কিছুতেই যেন হয় না"!

—"আজকে আদায় হয়ে গেছে সম্ভবতঃ, আপনি খোঁজ করবেন তো মীরা দেবী"।

মীরা তখন ওদের উৎসব-সমারোহের কথা শোনাতে এতই চঞ্চল যে, ওর কণ্ঠের মুখরতায় জয়ন্তর কথা অসম্পূর্ণ থেকে গেল। মীরা তার অন্তরের উৎসে আত্মসমাহিত হয়ে তখন বলেই চলেছিল—"কথা ছিল 'এন টি'র 'প্লেয়ার'দের একদিন এনে 'মুক্তি' 'প্লে'টা দেখা হবে—তা' বোধ হয় আর হয়ে উঠ্‌ল না। তবে শিশির ভাদুড়ীকে অগ্রিম বায়না দেওয়া হয়ে গেছে। কাল তিনি তাঁর রীতিমত নাটক—"

—"রাণী-মা, দিঘাপতিয়ার কুমার-বাহাদুর সস্ত্রীক এসেছেন। রায়সাহেব বিমলবাবুর ছেলেমেয়েরাও এসেছেন"। দাসী বাইরে থেকে জানালো।

মীরা পাপিয়াদের বস্‌তে ব'লে তাদের সাদর আপ্যায়ন কর্‌তে নীচে নেমে গেলো। জয়ন্ত পাপিয়াকে মৃদুকণ্ঠে বল্‌লো—"চলো, আমরা এবার যাই"।

উঠে দাঁড়িয়ে পাপিয়া বল্‌লো—"চলো, আমারও অসহ্য লাগ্‌ছে"।

তারপর ওরা চুপিচুপি চোরের মত নিঃশব্দ পায়ে পাশের একটা অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গিয়ে একেবারে বাইরের মহলে পূজাবাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হোলো। পূজা-কক্ষের সাম্‌নের বারান্দা ও উঠানটী দর্শকের ভীড়ে ভ'রে গিয়েছে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, কিশোরী-তরুণী, বালক-বালিকা একাগ্র-নয়নে প্রতিমার দিকে তাকিয়ে ছিল।

পাপিয়া বল্‌লো—"এস এখানে একটু দাঁড়াই, মাকে দর্শন করে যাই"।

পাপিয়া ও জয়ন্ত সেই ভীড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে আত্মগোপন করলো। তখন পূজামণ্ডপে সন্ধ্যারতির আয়োজন হচ্ছে। পূজারি ব্রাহ্মণ ব্যস্ত

হাতে সমস্ত গোছগাছ করছেন। ঢাক-ঢোল, কাসর-ঘণ্টা বাজতে সুরু হয়ে গেছে। হঠাৎ পূজারী ব্রাহ্মণ পঞ্চ-প্রদীপে অগ্নি-সংযোগ করতে করতে ভীষণ চম্‌কে উঠলেন। উঠানের দর্শকদের মধ্যে থেকে কে যেন একটা টিনের কৌটা ঘরের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল, তারই ঘা লেগে দেবী প্রতীমার একখানা হাত চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ভেঙে প'ড়ে পঞ্চ-প্রদীপের বাতি নিবে গেছলো। আরতি কার্য ওইখানেই স্থগিত রইলো—হৈচৈ কাণ্ড পড়ে গেল। অপরাধীর সন্ধানে সকলেই খুব ব্যস্ত হয়ে পড়্‌ল। একটা গরম কাপড়ের শতছিন্ন আলখাল্লা পরা, সম্ভবতঃ এক উন্মাদ ওইখানে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় ক'রে কী যেন বক্‌ছিল। তাকে দেখ্‌তে পেয়ে সকলেই—"এই ব্যাটা, এই ব্যাটারই কাজ"!—উত্তেজিত কণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠলো। গ্রেপ্তারের বাঁধনে উন্মাদ বাঁধা পড়লো।

তখন জয়ন্ত এবং পাপিয়া হাসপাতাল অভিমুখে চলেছিল। ওদের গাড়ীতে বসে পাপিয়া স্বামীর দিকে তাকিয়ে বল্‌লো—"কেন এমন করলে বলো তো? আহা, মায়ের আঙুলগুলি একেবারে ভেঙে খান্‌খান্‌ হয়ে গেল"!

বিকৃত ঠোঁটে একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে জয়ন্ত বল্‌লো—"কেনই বা করবো না তুমি বলো! সত্যই আনন্দের মূর্তিতে তো আজ তাঁর আবির্ভাব নয়, তবে কেন এ প্রাচুর্যের সমারোহ, কেন এ উৎসবের অনুষ্ঠান? তুমি জানো পাপিয়া, এই সুখের অন্তরালে কত বেদনার ফল্গুধারা নিঃশব্দে ব'য়ে যাচ্ছে? ওই আলো-হাসি, গান-বাজনার ভিত্তি দরিদ্রের দীর্ঘনিশ্বাসের উপরেই গড়ে উঠেছে"।

এ কথার কোনও যোগ্য উত্তর খুঁজে না পেয়ে পাপিয়া স্বামীর পকেট্‌

থেকে কতকগুলো দোম্‌ড়ানো সিগারেট বা'র ক'রে ঠিক্ করতে করতে বল্‌লো—"তাড়াতাড়িতে কৌটটা নিলে, সিগারেটগুলো একেবারে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে"।

—"সিগারেট ক'টা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ব'লে তুমি আক্ষেপ করছো পাপিয়া, তবু কী বা আমি প্রতিশোধ নিতে পারলুম বলো! চলো, হাসপাতালে দেখ্‌বে—একটা জীবন কী করে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে! হয় তো বা ভালো হবে—হয় তো বা—" জয়ন্ত সেই দোমড়ানো সিগারেটগুলো থেকে একটা নিয়ে অগ্নি-সংযোগে টান্‌তে সুরু করে দিল।

অনেক্ষণ ছ'টা বেজে গিয়েছে। পল্লীবধূ মিনু হয় তো বা তখনও প্রতীক্ষিত হৃদয় নিয়ে জান্‌লার একপাশে চুপটী করে দাঁড়িয়ে আছে। আশা-নিরাশার দোলায় ওর সকালের প্রতীক্ষা মৃদু কম্পমান—আর ওর সন্ধ্যার এই প্রতীক্ষায় আছে ঘন নিশ্বাস, আর প্রাণের একটা দ্রুত স্পন্দন।

খানিকটা দূরে ষ্টেশনে সন্ধ্যার মেল কিছুক্ষণ আগে বেরিয়ে গিয়েছে। তার বিরাট শব্দ তখনও মিনুর উৎকর্ণ কানের ভিতরে ঝম্‌ঝম্ করছে। স্তিমিত সন্ধ্যার সেই আলো-অন্ধকারে ঢাকা ধূসর পল্লীর আবছা পথের নিরবচ্ছিন্ন নীরবতায় ওর ব্যগ্র প্রসারিত দৃষ্টি আরও উন্মুখ আরও প্রতীক্ষা-চঞ্চল হয়ে উঠলো।

সমিতি

কৃষ্ণা চৌধুরী ও সতী মৈত্র। সত্য কথা বলতে কি, ওরা দুজনেই একটু স্বতন্ত্র ধরণের মেয়ে ছিল। পাঠ্য-জীবনে অধিকাংশ মেয়ের মত, দৈনন্দিন সংসার নির্বাহ কোরে, অথবা জীবিকা অর্জনের ভিতর দিয়ে পরবর্তী যাত্রা পথকে অতিক্রম করবার উদ্দেশ্য ওদের ছিল না। সে সম্বন্ধে ওদের রীতিমত নির্লিপ্ত এবং স্পৃহাশূন্য অন্তর, দুঃখে, দৈন্যে, পরাধীনতার কলঙ্কে নিপীড়িত জাতির প্রতি আর্দ্র মমতায় এবং নিবিড় অনুকম্পায় ব্যথিত ও বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। এর প্রতিবিধান করতে ওদের চিত্ত স্বতই লুব্ধ এবং উন্মুখ হয়ে উঠলেও প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করবার পথ ওদের পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল ছিল না, কারণ যে অর্থ সমস্যাই সংসারের সবচেয়ে প্রধান প্রশ্ন সেই অর্থের প্রতিকূলতাই ওদের কর্ম-জীবনের মূলে অন্তরায়ের সৃষ্টি করেছিল, কেননা ওরা সাধারণ ঘরের রাজকর্মচারীর কন্যা। তবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় মানুষের মনের যতই নিভৃততম স্থানে, যতই সঙ্গোপনে যে কোনও ফুল ফুটে উঠুক না কেন তার সৌরভে একদিন সে ব্যাকুল হয়ে উঠবেই। বোধ হয় সেইজন্য কৃষ্ণা ও সতী ওরা দুই বান্ধবী এম-এ পাশ করবার পর ওদের কৈশোর মনের ফুটে ওঠা মুকুলটী, দল মেলে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠলো এবং তারই পাগল করা গন্ধে আত্মসমাহিত হয়ে ঠিক করে ফেললো, দেশমাতৃকার বন্দনা করতে ওরা

গঠনমূলক কাজ করবে, নারী আন্দোলন, নারী জাগরণ, নারীকে শিক্ষায় দীক্ষায় শিল্পকার্যে, স্বাবলম্বী করে তোলাই ওদের কর্মজীবনের মুখ্যতম লক্ষ্য হবে। মফঃস্বলে গ্রামে গ্রামে ওরা নারীকল্যাণ সমিতি খুলবে; প্রত্যেক স্থানে একজন ক'রে মহিলা কর্মী পাঠাবে, যার দরদী মন ওদের উদ্দেশ্যকে সুন্দর ক'রে সাফল্যের সঙ্গে সুসম্পন্ন করতে পারবে এবং সেই সকল স্থানে ওদের পরিচিত একজন মহিলা অথবা পুরুষকে জেনারেল সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করতে হবে, যিনি শুধু অপরিচিতা মহিলা কর্মীকে সে স্থানের সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিতে পারবেন। ওরা ওদের এই উদ্দেশ্য দেশ বিদেশে ওদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবকে জানালো,—কিন্তু অর্ধেক পত্রের উত্তর এল না, যেগুলি এল তার আঁচড়ে অসম্মতিরই চিহ্ন আঁকা,—কেউ এই জটিল দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মত নয়। কেবল আসাম অঞ্চলের ছোট্ট এক পল্লী থেকে সুজিৎ বাগচী লিখলে।—

"কৃষ্ণা! তোমার চিঠি পেয়ে আমি বেশ একটা আনন্দ অনুভব করছি, তোমাদের সেবাস্নিগ্ধ দরদী মনের এই নিঃস্বার্থ সঙ্কল্প সত্যই যে খুব মহনীয় সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আমারও এই উদ্দেশ্যবিহীন নিঃসঙ্গ জীবনে কাজের মোহ একটা উদ্দাম, একটা প্রেরণাযুক্ত ছন্দ এনে দিতে পারবে। এখানে চা বাগানের বিস্তর কর্মচারী। আশা করা যায় তোমাদের নারীকল্যাণ সমিতি নিতান্ত ব্যর্থ হবে না। তাড়াতাড়ি কর্মী পাঠাও, তাঁর সব রকম সুব্যবস্থা আমি করে রাখবো।"

এই সুজিৎ বাগচী ওদের একদিন সহাধ্যায়ী ছিল, বি-এ পাশ করবার পর সে চা বাগানের সেয়ার নিয়ে আসাম প্রদেশে চলে গিয়েছিল।

*　　*　　*　　*

সুজিৎ বাগচীর একান্ত চেষ্টায় আসামের দরং অঞ্চলে নারীকল্যাণ শাখা সমিতির উদ্বোধন অনুষ্ঠান মহাসমারোহের সঙ্গে সুসম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। চা বাগানের প্রধান ম্যানেজার মিঃ বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন, এবং সতী ও কৃষ্ণাকে অভিনন্দিত করে বলেছিলেন, "আপনাদের এই উদার সঙ্কল্পে আমি বড় মুগ্ধ হয়েছি, আমার দ্বারা আপনাদের যদি কোনও উপকার হয়, জানাতে কুণ্ঠা বোধ করবেন না,—আমি তা পালন করতে সব সময় প্রস্তুত থাকবো।"

নম্র হেসে সতী বলেছিল, "আপনার মত একজন ধনী লোককে আমাদের সমিতিতে পাওয়া কত যে সৌভাগ্য সে আপনাকে বোঝাতে পারবো না, সত্য কথা বল্‌তে কি, আমাদের সমিতিতে অর্থের বড় অভাব—"

"তার জন্য কি ?" মিঃ বোস বলেছিলেন, "আমি মাসিক পঁচিশ টাকা কোরে আপনাদের সমিতির কার্যে সাহায্য করবো।"

সতী, কৃষ্ণা ও সুজিৎ আড়ালে বলাবলি করেছিল,—"যা হোক্‌ সভাপতির পদ দিয়ে একটা কাজ পাওয়া গেল, কাগজে নামটা তুলে দিলে আরও খুসী হবে।"

কয়েকটা দিন এই স্থানে তত্ত্বাবধান করবার পর সতী ও কৃষ্ণা কোলকাতায় ফিরে গেল। কোলকাতায় সতীদের একটা ঘরে ওদের সমিতির প্রধান কার্যালয়, সেই স্থানেই সমিতির কাজকর্ম চলে এবং অবসর মত ওরা দুজনে সমিতির উন্নতি সাধনে অর্থ উপার্জন করে। ওদের স্কুলের একজন সহাধ্যায়িনী বিধবা মেয়ে পুষ্প সেনকে শাখা সমিতির কর্মীরূপে পাঠিয়েছে। মেয়েটীও বেশ কর্ম-নিপুণা, হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিতে পারে, মেয়েদের লোভনীয় কার্য সূচিশিল্পেও দক্ষতা ওর অসীম। একমাসের

মধ্যেই তার এবং সুজিতের একটা আকর্ষণী প্রভাবে ওই অঞ্চলের চা বাগানের কর্মচারীর মেয়ে ও বধূরা সভ্যা এবং ছাত্রী তালিকাভুক্ত হয়ে পড়লো। চা বাগানের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে, তাদের সুবৃহৎ ক্লাবরুমে প্রত্যহ দুপুরবেলা দুই তিন ঘণ্টা, হপ্তায় তিনদিন ছাত্রীদের সূচিশিল্প, বয়ন, চরকার কাজ প্রভৃতি এবং দুইদিন বয়স্কা ছাত্রীদের বিদ্যা ও একদিন সঙ্গীত সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করা হয়। রবিবারে সভ্যাদের সমাবেশে একটী মিটিঙের আহ্বান কোরে, বক্তৃতা দেওয়া হয় এবং সভ্যাদের বক্তব্য শোনা হয়। চা বাগানের ম্যানেজারের স্ত্রী মিসেস বসুকে কার্য-নির্বাহক সমিতির সম্পাদিকার পদ প্রদান করা হয়েছে, তাঁর আয়ত্তে কয়েকজন সভ্যা, ছাত্রীদের বেতন, ফি আদায় প্রভৃতি সমিতির কাজকর্ম এবং সভ্যা ও ছাত্রী সংগ্রহ করে। মাসে একদিন আলোচনা বৈঠক বসে, সেই অধিবেশনে আয় ব্যয়ের হিসাবকার্য সম্পন্ন হয়। জেনারেল সেক্রেটারী সুজিৎ প্রধান কার্যালয়ের সঙ্গে চিঠি পত্রের আদান প্রদান করে, তারই বাঙ্গলোর পাশে চা বাগানের একটী অব্যবহার্য কোয়ার্টারে পুষ্পর বাসের সে ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

*　　*　　*　　*

কয়েকটা মাস অতিক্রম করেছে। সেদিন বিকেল বেলায় সতী অফিস রুমে সমিতির কাজ কর্ম করছিল, ওর হাতে সদ্য আসা সুজিতের একখানা পত্র, ভ্রূর রেখায় চিন্তার একটা প্রগাঢ় ছায়া ফুটে উঠেছে। সেই সময় কৃষ্ণা হাসিমুখে ঘরে ঢুকে বললো, "বড়লোকের মেয়ে বউরা শুধু যে বসে বসে রাণীগিরি করবে, আর ফুলে উঠবে তা হবেনা, কাজকর্ম কিছু না হয়

না করুক,—টাকা পয়সা দিয়ে সমিতির সাহায্য করতে তাদের হবে, মীরা ভট্টাচার্যির কাছে মাসিক দশ টাকার ব্যবস্থা করে এলুম—"

"সে তো করে এলি তুই, এদিক্‌কার আবার খবর শোন্—" ঈষৎ বিরক্তমুখে সতী বল্‌লো,—"এ পরিশ্রম আমাদের হয়তো বা শুধু ব্যর্থতার ভারেই ভারাক্রান্ত হয়ে উঠবে, সুজিৎ লিখেছে, দরং সমিতির মেয়েরা নাকি পুষ্পকে চায় না—"

"কেন, আবার গণ্ডগোল বাধিয়েছে বুঝি ?" উদ্বিগ্নমুখে কৃষ্ণা জিজ্ঞেস করলো, "সেবার উদ্বোধন মিটিঙে ফটোর গ্রুপ তোলা নিয়ে হাঙ্গামের সৃষ্টি করেছিল না ?"

এইবার সতী একটু না হেসে পারলোনা, বল্‌লো, "হ্যাঁ সেবার সমিতির উদ্বোধনের সময় সুজিৎ ফটো তোল্‌বার বন্দোবস্ত করে রেখেছিল, মিটিঙের পর যে সব সভ্যা এবং ছাত্রীরা এনলাইটেণ্ড মেয়ে, জড়তা যাদের কেটে গেছে, তারা আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালো। তাদের নিয়ে ফটো তোলা হয়ে গেল। কিন্তু সেইখানেই হোল জটিল জালের সৃষ্টি, আমাদের সঙ্গে ফটো যাদের উঠলো, তাঁরা শিক্ষিতা মেয়ে, কিন্তু ঐশ্বর্যবানের স্ত্রী নয়। যে সব সভ্যারা ঐশ্বর্যবানের মেয়ে, বধূ তাঁরা উষ্ণ হয়ে বললো "সামান্য সব কর্মচারীর "ইস্তিরিরা" গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে ফটো তুল্‌লেন, আর আমরা অফিসারের ঘরণী হয়ে শুধু চাঁদা দিয়েই মরবো—"

কৃষ্ণা বলে উঠলো, "তা তাঁরা সব ছিলেন কোথায়, এলে কি আর ফটো নেওয়া হোত না ?" "সেই কথা বলবে কে ?" সতী বল্‌লো—, "পুষ্প বলেছিল, আপনারা যদি তুল্‌তে আস্‌তেন—আপনারা যখন এ সমিতির সম্মানিত সভ্যা, তখন সবচেয়ে আগে আপনাদের বসার আসন দেওয়া

হোত—, সামান্য এই কথাতেই তারা সব খাপ্পা হয়ে উঠেছিল। অথচ দেখ্ তুই ওরা পুরুষ মানুষকে ভয়াবহ জন্তুতুল্য মনে করবে, বেরুবে না তাদের সুমুখে, পুরুষের পাশে বসে ফটো তোলাকে বেহায়াপনা বল্‌বে, আবার যারা ওই কুসংস্কারের অন্ধকূপ হতে বের হতে পেরেছে, তাদেরও মেনে নিতে পারবে না—" কয়েকমুহূর্ত্ত থেমে আবার সতী বললো, "আসলে কি জানিস্ কে ছোট কে বড় এরই একটা তুমুল দ্বন্দ্ব নিরন্তর ওদের মনের ভিতরটা কুরে কুরে খাচ্ছে, শিক্ষিতা মেয়েরা শিক্ষিত সমাজে আপন যোগ্যতা দিয়ে সম্ভ্রম, মর্যাদা অর্জন করে, কিন্তু ধন বিলাসিনীদের মদমত্ততা শুধু অন্দরমহলেই অবরুদ্ধ থাকে—এ সবের মীমাংসা, প্রতিবিধান কে করতে পারে তুই বল্ ?"

"কেউ পারবে না, স্বয়ং বিধাতা পুরুষও নয়," অধরপ্রান্তে একটা ব্যর্থতাসূচক শব্দ ক'রে কৃষ্ণা বললো, "ওরা যেদিন বুঝতে শিখ্‌বে, শিক্ষা, অর্থ, যশ, সম্মান সব কিছুর চেয়ে মানুষের অন্তরের আত্মা, অর্থাৎ মানুষ বড়, সেইদিন সব দ্বন্দ্ব সাগরের জলের মত স্বচ্ছ হয়ে উঠবে। সেইজন্যেই সব কাজের মূলে শিক্ষাই তার প্রথম অধ্যায়। নাঃ এরা জাগ্‌বে না, অজ্ঞতার ঘোর থেকে এদের জাগ্রত করা অসম্ভব, নিতান্তই যদি জাগিয়ে তুল্‌তে হয়, তবে জ্ঞানার্জনের জন্য সর্বপ্রথম বিদ্যালয়ে পাঠাতে হবে, তা-না হলে আমাদের সব সাধনা ব্যর্থ হয়ে যাবে। হ্যাঁ এবার আবার কী নিয়ে অনর্থ ঘটালো বলতো ?" "সে যে আমার বলতে গেলে হাসিতে দম বন্ধ হয়ে আসবে; এই নে তুই পড়ে দেখ সুজিতের চিঠি।" সতী কৃষ্ণার হাতে সুজিতের চিঠিখানা দিল।

নৈরাশ্যের হাতে চিঠিখানা খুলে, আলস্য মাখানো চোখে কৃষ্ণা পড়লো—

কৃষ্ণা,

সঙ্গোপনে

অনেক আশা নিয়ে সমিতির কাজ সুরু করা গেছলো, কিন্তু এর শেষ যে কোথায় কিছু বুঝতে পারছি না। হয়তো আমরা পথের ঠিক সীমানা নির্দেশ করে চলতে পারিনি, কেননা যারা আজীবন সংসারের ছোট গণ্ডীর ভিতরে আবদ্ধ রইলো, শিক্ষা, জ্ঞান আহরণ যাদের ভাসুর ভাদ্র-বধূর সম্পর্ক, তাদের হঠাৎ জাগিয়ে তোলা কি সম্ভব হবে? সামিতিসরের ক্লাসগুলিকে ওরা করতে চায় পর-আলোচনার নিলয়! শাড়ী আর ব্লাউস, গহনা আর টাকা—এর চেয়ে প্রিয় আলাপ সংসারে ওদের বুঝি আর কিছুই নেই। সেই সেবারকার মত, এই নিয়ে বাধিয়েছে আবার বিষম বিভ্রাট; তোমরাও নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধের আলাপ আলোচনা কিছু কিছু জানো, তাই আর বিস্তারিত বর্ণনা করলুম না। তবে জানাচ্ছি, সে মহামারী কাণ্ড, রাম রাবণের যুদ্ধের সঙ্গেই তার তুলনা চলে! তাইতে পুষ্প সেন বলেছিলেন—, "আপনারা এখানে কেন ওসব আলোচনা করছেন? এটা মনে করুন নারীকল্যাণ সমিতি, শিক্ষার আলয়।" আর যায় কোথায়? সব ধনীর গৃহিণীরা খাপ্পা হয়ে প্রচার করলেন, "কে কোথাকার একটা বিধবা মেয়ে এসে আমাদের শাসন ক'রে চোখ রাঙাবে, একবার আমরা বরদাস্ত করেছি, আর কিছুতেই কোরবোনা, এই সমিতির ভাঙ্গন ধরিয়ে তবে ছাড়বো।"

অনেক কোরে বোঝাতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, পুষ্প সেনের পরিবর্তে অন্য মহিলা যদি আসে তবে ওরা সমিতির সঙ্গে সংস্রব রাখতে পারবেন।

সুতরাং এক্ষেত্রে আমাদের আর একটু ধৈর্য ধরতে হবে, হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। পুষ্প সেনও এদের ভিতর থেকে মুক্তি পেতে চান, শুধু তোমরা রাগ করবে বলে কিছু বলেন না। জানো তো কবি বলেছেন, "শিশু কখনও আছাড় না খেয়ে হাঁটতে শেখে না।" এদের দৌলতে অনেক

অভিজ্ঞতা অর্জন করা গেল। আশা কর্‌ছি এই সঞ্চয়টুকু ওদের কারবারের যোগে আর আমাদের বিপর্যস্ত করতে পারবে না। যত শীঘ্র সম্ভব কর্মী পাঠিয়ে দিও।

চিঠিখানা সজোরে দূরে নিক্ষেপ কোরে কৃষ্ণা বললো, "উপযুক্ত কর্মী মেয়ে যে আবার কোথায় পাবো তাও জানি না—"

সতী বললো—"তোর মনে আছে বোধহয় ক্ষমা মুখার্জি বলে' একটী মেয়ে আমাদের সঙ্গে ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়তে পড়তে এক শিখ্ ছেলেকে বিয়ে কোরে রেঙ্গুন চলে গেল; সেদিন কাগজে দেখলুম সে কী যেন একটা কারণে স্বামীকে ডিভোর্স ক'রে কোলকাতায় বাপের বাড়ী এসেছে; তাকে খবর দিলে কেমন হয়? সে নিশ্চয়ই রাজী হবে—"

একটু আশার রশ্মি দেখতে পেয়ে কৃষ্ণার অন্ধকার মুখটা আনন্দের আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, সে তার ছোট ছাতাটী নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, "তুই যাহয় করিস্ ভাই একটা ব্যবস্থা, আমি এবার বাড়ী যাই, সেই সকালে বেরিয়েছি; বাবা হয়তো ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।"

*　　　*　　　*　　　*

দরং অঞ্চলের একটী জন-বিরল ছোট্ট ষ্টেশনে একখানি ট্রেণ এসে থাম্‌তে, থার্ড ক্লাশের মেয়ে কাম্‌রা থেকে একটী পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের মেয়ে নেমে পড়লো। মেয়েটীকে বাঙ্গালী হিন্দু রমণী বলেই মনে হয়, কিন্তু সাধবোর কোনও চিহ্নই তার প্রসাধনে ছিল না, হয়তো বা সে কুমারী মেয়ে—

তখন সকালবেলা; কিন্তু ও অঞ্চলটায় কুলী দেখতে পাওয়া যায় না, গাড়ী অনেকক্ষণ দাঁড়ায় এই সুবিধে। মেয়েটী সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে প্ল্যাট-

ফরমের এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো, এমনি সময় হাসিমুখে সুজিৎ এগিয়ে এসে, সঙ্গের ভৃত্যকে লগেজপত্র নামাতে বলে' মেয়েটিকে বললো—"এস, চল কোয়ার্টারে যাই, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ, খুব কষ্ট হোল নিশ্চয়ই? আমি তোমায় ফার্ষ্ট ক্লাশে খুঁজছিলুম—, ক্রোড়পতির স্ত্রী—"

ওর সঙ্গে হাটতে হাটতে মেয়েটী বললো, "এখন ঠাট্টা রাখো সুজিৎ, এখানকার কাজকর্মের কথা আগে বুঝিয়ে বলো, কৃষ্ণার কাছে যখন শুনলুম তুমি এখানে আছ, তখন এই আসাম মুলুকেও আসার মধ্যে বেশ একটা প্রেরণা অনুভব করলুম—"

ওই স্থানটা মুখরিত কোরে হেসে উঠে সুজিৎ বললো—, "এই একটা দরিদ্র, ছন্নছাড়া মানুষের জন্যে এই সুদূর বিদেশে আসার তুমি প্রেরণা পেলে—, কী বলবো তোমায় মিসেস আলিওয়ালা না মিস্ মুখার্জি? এ তো আমার বিশ্বাস হয় না, হ্লাদিনের সহাধ্যায়ী, অথবা ক্ষণিকের বান্ধব ছাড়া তোমার সঙ্গে আমার আর কিছু সম্বন্ধ ছিলনা নিশ্চয়ই?"

মেয়েটী বললো—"দেখো সুজিৎ যা হবার হয়ে গেছে, তুমি আমায় ধাক্কা দিয়ে কথা বোলো না, ক্ষমা দেবী বলে ডেকো তাহলেই হবে!"

"ক্ষমা দেবী" ঈষৎ পরিহাসের তরলকণ্ঠে সুজিৎ বললো, "যদি দেবী বলতে ভুল হয়ে যায় মনে কিছু করবেনা তো?"

"সে তোমার যা খুসী তাই বলে ডেকো" গলার স্বর নিম্নতম কোরে ক্ষমা বললো, "তবে শোন, এখানে আমার সত্য পরিচয় দিও না যেন, সতীর কাছে শুনলুম এখানকার ভদ্রমহিলারা নাকি মানুষের বাইরের পরিচয়কে মুখ্য কোরে সম্মান, অসম্মান দেখায়—"

"সে তোমাকে বলতে হবে না, আমি তাঁদের হাড়, অস্থিমজ্জাগুলো

পর্যন্ত এই কয়মাসে চিনে নিয়েছি—একমাত্র ঐশ্বর্যই সংসারে তাঁদের শ্রেষ্ঠতম বস্তু—তাই জানিয়ে দিয়েছি, এবারে যিনি মহিলা কর্মী আসছেন, তিনি বিখ্যাত ব্যারিষ্টার পি-এন মুখার্জির মেয়ে কুমারী ক্ষমা মুখার্জি,—তুমি ওদের কাছে একটু বেশী মাত্রাতেই সম্ভ্রম পেতে পারবে।" ওরা কোয়ার্টার্সে পৌছে গেছলো. ক্ষমা ঘর দুয়ার ঘুরে ফিরে দেখ্‌লো। একজন মানুষের পক্ষে বেশ সুষ্ঠু ব্যবস্থা, লোহার খাট, টিপয়ে, চেয়ার প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বস্তুগুলোও সুন্দর কোরে সাজানো রয়েছে। ক্ষমা খাটের উপর বসে পড়ে আরামের একটা নিশ্বাস ফেলে সুজিতকে বল্‌লো—"তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বোস, এই ঘরের মধ্যে বেশ একটা শান্তির বাতাস বইছে যেন,—তুমি অনুভব করতে পারছো সুজিৎ ?"

"কই না তো" সুজিৎ বল্‌লো আমি এখন বসতে পারবোনা, অফিস আছে, আমি এখন চললুম, বিকেলবেলায় এসে তোমায় সমিতির মহিলাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে আনবো, এই চাকর রইলো সব কাজকর্ম করে দেবে, কোনও অসুবিধে হলেই আমাকে জানিও। "অসুবিধে ? বল কী তুমি সুজিৎ,—এমন স্বাধীন জীবন যাত্রায় সত্যই একটা সুখের সন্ধান পাওয়া যায় যেন, আঃ কী শান্তি, নিরবচ্ছিন্ন শান্তি—"

"এইজন্যই বুঝি মিঃ আলিওয়ালার পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন কোরে চলে এলে ?" সুজিতের ব্যঙ্গের কণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে উঠলো "তিনি পূর্ব স্ত্রী গোপন ক'রে বিয়ে করেছিলেন তোমায়, সেইটুকু বুঝি ডিভোর্সের সুবিধের জন্য উপলক্ষ্য কোরে লাগিয়ে দিলে—?"

"আর সে কথা থাক্ এখন সুজিৎ, ভেবেছিলুম বুঝি ক্রোড়পতির ঘরে—"

"সে কখনও হয় না ক্ষমা" তীক্ষ্ণকণ্ঠে সুজিৎ বলে উঠলো, কারও দীর্ঘনিশ্বাসের ভিত্তির উপর কারও সুখের ঘর কখনও রচনা করা চলে না। বড় বড় রাষ্ট্রের ব্যাপারেও তুমি লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে, দীর্ঘনিশ্বাস যার মূলে আছে—সে রাষ্ট্র পরিচালনা কখনও বড় অথবা সুখের হতে পারেনি —" হঠাৎ সুজিতের দৃষ্টি ক্ষমার ব্যাথা-বিষণ্ণ করুণ দু'টী চোখের উপর পড়তে, সে ত্রস্তপায়ে চলে গেল, বারান্দা দিয়ে উঠানে নামতে নামতে বল্‌লো—, "ঠিক মত খাওয়া দাওয়া কোরো, কিছু দরকার হ'লে অফিসে আমায় খবর পাঠিও।"

এ কথার ক্ষমা কিছু উত্তর দিলনা, ওর কণ্ঠস্বর হয়তো বা তখন স্বভাব স্বচ্ছ ছিলনা। বিকেলবেলা সুজিৎ সভ্যা ও ছাত্রীদের একটি সভার আহ্বান কোরে নূতন কর্মী ক্ষমার সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিল। কোয়ার্টার্স অভিমুখে ফির্‌তে ফিরতে সুজিৎ ক্ষমাকে জিজ্ঞেস করলো "কী রকম মনে হোল, চালাতে পারবে তো এদের।"

"দেখা যাক" মৃদু হেসে ক্ষমা বল্‌লো—"আমার যত দূর মনে হয় এরা সব শাসন না পাওয়া শিশুর মত বেপরোয়া অবুঝ, বুদ্ধির নেই দীপ্তি, নেই প্রাখর্য ; তাই ওরা অত চঞ্চল—"

"—ওদের মনের ভিতরের ওই অবুঝ শিশুর দৌরাত্ম্যের একটা খুব সহজ ওষুধ কী জানো ক্ষমা, মাঝে মাঝে তোমায় চড়িপাটী কোরে খাওয়া দাওয়ার জন্য পিক্‌নিকের ব্যবস্থা করতে হবে, তবে খাওয়ার চেয়ে রন্ধন প্রীতিটাই ওদের খুব বেশী, এইজন্য এদিকটায় ওদের একটা আকর্ষণও আছে। দেখবে তুমি টাকা পয়সা দিতে ওরা মোটেই কুন্ঠিত হবে না, উৎসাহের সঙ্গে নিজেরাই চাঁদা সংগ্রহের সব ব্যবস্থা করে ফেলবে। সেদিন

পুষ্প সেনের বিদায় অভিনন্দনের অনুষ্ঠানে একটা ফিষ্টের আয়োজন করেছিলুম, সে ওদের কি গভীর আগ্রহ; পুষ্প সেনের সম্বন্ধে সব বিভ্রম হয়ে, তাঁকে নিয়ে পরম আনন্দে সব উচ্ছ্বাসে যেন মশগুল হয়ে উঠেছিল—" এই পর্যন্ত সুজিৎ বলতেই, ওর কথাকে সম্পূর্ণ কোরে দিয়ে ক্ষমা বল্‌লো—"তা'হলে বলো এই চড়ুইভাতি, ফিষ্ট এগুলি হবে অবাধ্য শিশুকে আয়ত্তে আনবার একটা কৌশল, একটা ফন্দী; অর্থাৎ শিশুর লোভনীয় বস্তু রঙ্গিন খেলনা, কলের গাড়ী, ফুটবল প্রভৃতি; কেমন ?"

সেদিন পথের সীমানা ফুরিয়ে যেতে সুজিতের চা বাগানে কাজ থাকার জন্য ওদের আলোচনার ওইখানেই পরিসমাপ্তি হয়েছিল। তবে ওদের যুক্তি তর্ক শুধু বাক্য আড়ম্বরেই ব্যর্থ হয়নি, কার্যকরী যে হয়েছিল, সে কথা স্বীকার করতেই হবে।

নূতন কর্মী ক্ষমাকে পেয়ে ভদ্রমহিলাবৃন্দ অপর্যাপ্তই খুসী হয়েছেন, নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেন—"বেশ নম্র—চমৎকার স্বভাব মেয়েটীর—, বড়লোকের বেটী কিনা, পয়সা থাকলেই তাদের ধরণ আলাদা হয়।" তাঁরা ক্ষমাকে সমীহের সঙ্গে সম্ভ্রম কোরে চলেন, সমিতির কাজকর্মও তাঁদের সাহায্যে সুনিয়ন্ত্রিত পরিচালনায় সুন্দর হয়ে উঠলো। মহাসমারোহের সঙ্গে একদিন একটা ফিষ্টের উৎসবও সুসম্পন্ন হয়ে গেল। তার পরের দিন সুজিৎ বললো ক্ষমাকে—"ফিষ্ট নিয়ে ওরা কিছু গণ্ডোগোল করেনি তো, সমিতির চাকরটা কি যেন সেইরকম বল্‌ছিল—"

ক্ষমা ওর আসনে ফিরে গিয়ে নিভু নিভু স্টোভটায় পাম্প দিতে দিতে বল্‌লো—"কাঞ্চন তোমায় ভুল বলেনি সুজিৎ, আকাশে মেঘ প্রায় ঘনায়মান হয়ে উঠেছিল, আর একটু হলেই তুমুল ঝঙ্কারই সূত্রপাত হোত ঠিকই,

—হঠাৎ কারসাজি কোরে নিজেই বাতাস হয়ে অনেক কৌশলে সে মেঘগুলিকে উড়িয়ে দিতে পেরেছিলুম—"

নিশ্চয়ই ওদের অন্তরের সেই প্রধান দ্বন্দ্ব, ছোট আর বড়, বড় আর ছোটর সমস্যা, তাই নয়?"

"ঠিক তাই" ক্ষমা বল্‌লো,—"এখন হয়েছে কি রান্নার পর্ব সারা হোলে একসারি সভ্যা খেতে বসেছেন। কয়েকজন মহিলা পরিবেশন করছেন, আমি এবং শাখা-সম্পাদিকা দু'জনে করছি তত্ত্বাবধান! একটী মেয়ে পোলাও দিতে এসে সর্বপ্রথম মহিলাদের দিকে চোখমেলে দেখে নিয়ে সারির প্রথম থেকে পরিবেশন সুরু না কোরে, একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালেন; কারণ তাঁর চোখে সেখানে বসেছিলেন নাকি কয়েকজন বিশিষ্টা মহিলা। সেই তিনজনের মধ্যে প্রথমজন এক পাদ্রী মেমসাহেব মিসেস্ "লী", দ্বিতীয়জন এক উচ্চস্তরের অফিসারের অবগুণ্ঠিতা বধূ তরুবালা, তৃতীয়জন সামান্য এক ডাক্তারের বিদুষী পত্নী গ্রাজুয়েট রমা রায়—"

"নিশ্চয়ই এই তিনজনের মধ্যে কাকে প্রথম পরিবেশন কোরে তাকে সম্মান প্রদর্শন করা হবে, এই চিন্তা জটিল হয়ে উঠ্‌লো—" সুজিৎ এক দৃষ্টে ক্ষমার দিকে তাকিয়ে রইলো। "সত্যি সুজিৎ তুমি ওঁদের প্রতি জৈবকণাটিরও খবর রাখো দেখছি" মৃদু হেসে ক্ষমা বল্‌লো, "হ্যাঁ রাজবংশের সম্মানে মিসেস্ লী, প্রথম স্থান অধিকার করলেন, মধ্যের ধনীর পত্নী তরুলতাকে বাদ দিয়ে পরিবেশনকারিণী শিক্ষার প্রতি একটা স্বভাবতঃ সম্ভ্রম নিয়ে রমা রায়কে সম্মানিত করতে উদ্যত হয়েছিলেন, আমি হাতের ইঙ্গিতে তাকে বাধা দিয়ে বুঝিয়ে দিলুম, এ সমাজে যে

শিক্ষার আগে ঐশ্বর্যের সম্মান; তরুবালার মুখটী গর্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, রমা রায় আমার দিকে একেবার তাকিয়ে নতমুখে ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাস্‌লেন।"

সুজিৎ বল্‌লো,—"না হেসে তাঁর আর উপায় কী? তিনি তো আর কোমরে কাপড় জড়িয়ে লড়াই করতে শেখেননি, কিন্তু তাঁদের উচিৎ ছিল সারির প্রথম থেকে পরিবেশন করা" ক্ষমা বল্‌লো,—"নিশ্চয়ই, আমি বাধা দিলুম না, আবার যদি কিছু বিভ্রাট ঘটে সেই আশঙ্কায়, তাছাড়া সারির প্রথম দিকে যে কয়জন বসেছিলেন, তাঁরা অর্থের দিক দিয়ে হয়তো বা বড় না হতে পারেন, কিন্তু শিক্ষা, সম্ভ্রমের দিক দিয়ে ছোট নয়। আর মানুষকে যদি সকল সময় তুমি তুচ্ছ, তুমি ছোট এই কথা প্রমাণ করা হয়, সে কাজকর্মে কী করেই বা উৎসাহ পায় বল? যাদের প্রতীকার করবার পথ আছে, তারা করে, যাদের নেই তারা নির্জীব হয়ে সংসারে বেঁচে থাকে।"

ওদের তখন চা খাওয়া হয়ে গেছলো, সেদিন ছিল রবিবার, মিটিং সুরু হতে আর দেরী নেই,—ওরা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো।

* * * * *

সেদিন বিকেলবেলা ক্ষমা সমিতি থেকে ফেরবার সময় দেখ্‌লো, সুজিতের বাঙ্গলোর সব দরজা জানালাগুলি খোলা রয়েছে, এ সময় সে সচরাচর অফিসেই থাকে, আজকে ওই উন্মুক্ত দুয়ার জানালাগুলি তার গৃহে উপস্থিতি প্রমাণ করছিল। ক্ষমা নিজের কোয়ার্টার্সে না গিয়ে, তার

বাঙ্গলোর গেট পার হয়ে সোজা তার ঘরে যেয়ে প্রবেশ করলো। সুজিৎ সেদিনের খবরের কাগজ পড়ছিল, ওর পায়ের শব্দে চোখ তুলে বললো, "এই যে এস, চা করতে বলি, বসো।"

"না, বসবোনা আর সুজিৎ, বলেছিলে একদিন সুবিধে মত তোমাদের চা বাগানের কুলী বস্তিতে বেড়াতে নিয়ে যাবে, চলোনা আজ বেড়িয়ে আসি, ফিরে আমার ওখানেই চা-এর পর্ব সারলে হবে।"

"বেশ তাই চলো" খুসী হয়ে সুজিৎ বল্লো।

সুজিতের বাঙ্গলোর দক্ষিণ দিকের যে আঁকা বাকা কাঁচা পথটী সুদূরের কোন্ সীমানায় অন্তর্হিত হয়েছে, সেই সঙ্কীর্ণ রাস্তাটী ধরে ওরা দুজনে হাঁটতে লাগলো। দুই পাশে ওদের চায়ের বাগান, নিবিড় সবুজের সেই বনানীতে যেন ডুব দিয়ে, কুলী এবং কুলী রমণীরা চা পাতা তুল্‌ছে। দূর থেকে শুধু ওদের মাথাগুলো দেখা যাচ্ছে। পূর্বদিকে মেঘের কোলে বিলীয়মান ভূটান পর্বতের ধূসর রেখা অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। খানিকটে গিয়ে ওরা বাঁ দিকে বাঁক নিতে, দেখা গেল কুলী বস্তী; দুইপাশে সারি বাঁধা অগুণ্তি মেটে ঘর, মধ্যের রাস্তা দিয়ে অতিকষ্টে একজন মানুষ হাঁটতে পারে, তাও সে পথ ভাঙ্গা মদের হাঁড়ি, পচা ভাত তরকারী ইত্যাদি আবর্জনায় স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে, নানা জাতীয় পোকা, মশা, মাছি ভ্যান্ ভ্যান্ করছে, বিকট দুর্গন্ধ বাতাসকে বিষাক্ত কোরে তুলেছে।

সুজিৎ জিজ্ঞেস করলো, "ফিরবে, না আরও কিছু দেখবে?"

নাকে রুমাল চাপা দিয়ে ক্ষমা বল্লো, "এসেছি তো ওদের ভিতরেরও

নরক দৃশ্য দেখে যাবো। আচ্ছা সুজিৎ তোমরাই তো এখানকার হর্তা কর্তা, এর কিছু প্রতিবিধান করতে পারো না?"

সুজিৎ বল্‌লো—"হর্তা, কর্তা আমরা হতে পারি ক্ষমা, কিন্তু চাবী কাঠি তো আমাদের হাতে নয়; জানো সেবার এক আণ্ডার ম্যাট্রিক কুলীর সর্দার সাহেবকে কুলীদের দুঃখ দুর্দশার সম্বন্ধে উচিৎ কথা গোটাকতক বলেছিলো বোলে, তাকে ডিসচার্জ করা হয়েছিল। তাই না কথায় বলে লোকে চা বাগানের কুলী, কেউ আস্‌তে চায় না বোলে চুরি কোরে ধরে বেঁধে আনা হয়। একটা কুটীরের সুমুখে দাঁড়িয়ে সুজিৎ বল্‌লো, "এস এই আমাদের সেখু কুলীর বাড়ী,—সে বোধহয় এখনও বাগান থেকে ফেরেনি—ঘর খোলা, ওর স্ত্রী গাঙ্গী আছে বোধহয়—"

ওরা দু'জনে একটা কুটীরপ্রাঙ্গনে ঢুকে পড়লো। ছোট্ট একটু উঠানের একপাশে, খুব নিচু একখানা ঘরের সুমুখে রান্নার জন্যে এক ফালি দাওয়া, মাটীগুলো তার শুকনো হয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে, রোদে পোড়া, জলে ভেজা তারই চালের জীর্ণ খড়গুলো মেঝে ছুঁয়ে নেমে নেমে আস্‌ছে, একটা বাচ্চা ছাগল মুখ উঁচু কোরে সেগুলি পরম পরিতোষের সঙ্গে চিবুচ্ছে।

"এরা নিজেরা দু'সন্ধ্যে পেটভরে খেতে পায় না, কিন্তু জন্তু প্রীতিটা এদের কিছু বেশী, নয় সুজিৎ?" ক্ষমা ওই ছাগলটার দিকে তাকিয়ে বল্‌লো।

ওদের কথাবার্তা শুনে ঘরের ভিতর থেকে একটা উনিশ, কুড়ি বছরের কুলী বধূ বেরিয়ে এল, পরেছে সে একখানা ডোরা কাটা ছিটের টুক্‌রো লুঙ্গির মত কোরে, বুকে এক ফালি ন্যাকড়া বাঁধা। দেহের

নগ্নতার প্রয়োজনীয় আব্রু রক্ষা করতে,—এগুলি তার পক্ষে যথেষ্ট আবরণ হয়েছিল। পিঠের সঙ্গে ওর একটী শিশুপুত্র বাঁধা, সম্ভবতঃ সে এখুনি বাগান থেকে ফিরেছে।

মেয়েটী হাসিমুখে সুজিতের দিকে তাকিয়ে, দাওয়ায় একটী মাদুর পেতে দিয়ে ওদের বস্‌তে বল্‌লো—"সাদী করেছ বাবুজি? কবে করলে, বউ তোমার খাসা হয়েছে।" ও এগিয়ে এসে ঢিপ কোরে ক্ষমাকে একটী প্রণাম করলো।

"নারে গাঙ্গী এখন আর বসবো না" সুজিৎ বল্‌লো—"দূর, এ আমার বউ হবে কেন? বন্ধু, দোস্ত, বুঝেছিস্‌? সেথু কোথায় রে? কখন ফিরবে?"

"সে আজ ফিরবেনা, ম্যানেজার সাহেব তাকে তাঁর বাঙ্গলোয় আজ থাক্‌তে বলেছে" খানিকটা দূরে ক্ষমা ওর শিশুটীকে তার পিঠের ঝুলি থেকে তুলে নিয়ে আদর করছিল, কুলীদের ঘরের ছেলে হলেও শিশুটী ভারী সুন্দর, ফুট্‌ফুট্‌ করছে, যুঁই ফুলের মত রং, চমৎকার স্বাস্থ্য; সে হঠাৎ বলে উঠলো,—তোমার স্বামী রাত্রিতে ফিরবে না, এই জঙ্গলে তোমার ভয় করবে না?"

"ভয় কি মায়জী? একা তো থাকবো না, সন্ধ্যার পরই সাহেব, বাবুরা আসবে, বসবে" কুলী রমণী তার অনভিজ্ঞ সরল প্রাণে আরও কত কী বল্‌তো কে জানে? ওকে থামিয়ে দেবার উদ্দেশ্য নিয়েই সুজিৎ বল্‌লো, "দেখছিস তো গাঙ্গী সন্ধ্যে হয়ে এল, টর্চ আনতে ভুলেছি, এইবার আমরা ফিরি।"

"হ্যাঁ বাবুজি কাল সন্ধ্যের পরই—বাঘ দুটো গোরু মেরেছিল," মেয়েটী একটু হেসে ক্ষমাকে বল্‌লো,—"আবার এস মায়জী।"

"আসবো, তুইও যাস্ তোর ছেলেটী নিয়ে, বুঝ্লি ?"

কুলীদের বস্তি থেকে বেরিয়ে এসে সুজিৎ বল্লো, "গাঙ্গী যখন বল্লো,—তার স্বামীকে ম্যানেজার সাহেব তাঁর বাড়ীতে রাত্রিবেলা থাক্তে বলেছে, তখনই বুঝ্লে না এই কুলী রমণীরাই তাদের অবসরের চিত্ত-বিনোদনের রমণীয় বস্তু ?"

"না না সুজিৎ, এই শ্রেণীর মেয়েদের এমন কোরে নরকে পচ্তে দিলে হবেনা, ওদের উদ্ধার করাও আমাদের একটী অন্যতম কাজ হবে,—বলো তুমি আমায় সাহায্য করবে ?"

"নিশ্চয়ই করবো" সুজিত বল্লো,—"তুমি শীঘ্রই একটা সভা আহ্বান কর, আমি জঙ্গলে পশু বিড কোরে আনার মত, কুলী বস্তী উজাড় কোরে নিয়ে আস্বো, তুমি হিন্দি ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে ওদের জীবনের মূল্যটা বেশ কোরে বুঝিয়ে দিও।"

ক্ষমা বল্লো,—"তবে এ সম্বন্ধে সর্বপ্রথম আমাকে শাখা-সম্পাদিকা ও সভ্যাদের সঙ্গে আলোচনা কোরে একটা দিন স্থির করতে হবে—"

"এই তো সুমুখেই শুক্রবারেই না তোমাদের কার্যনির্বাহক সমিতির মাসিক অধিবেশন, সেইদিন মিটিঙে দিন ইত্যাদি সব বন্দোবস্ত করে ফেলো," ওরা তখন গৃহ-প্রত্যন্তে পৌছে গেছ্লো, সুজিৎ বল্লো,—"সবচেয়ে আগে আমাকে চা খেতে দাও, তারপর অন্য কথা হবে।"

* * * *

কয়েকদিন পর সেদিন কার্য নির্বাহক সমিতির মাসিক অধিবেশনের আলোচনা সবেমাত্র সুরু হয়েছে। সুবৃহৎ ক্লাব কক্ষের মাঝখানে একটী ছোট টেবিলের সুমুখে সমাসীনা ক্ষমা এবং শাখা-সম্পাদিকার দুই পাশের খানকতক চেয়ারে সভ্যাদের মধ্যে কর্মী মেয়েরা বসেছেন। দেওয়াল প্রান্তের সারিবাঁধা বেঞ্চগুলি অন্যান্য সাধারণ সভ্যাদের নির্দিষ্ট আসন। আয়, ব্যয়, ছাত্রীদের শিক্ষা এবং সভ্যাদের বক্তব্য সম্বন্ধে আলোচনার পর ক্ষমা সকলের দিকে তাকিয়ে একটু স্নিগ্ধ হেসে, বিনম্রকণ্ঠে বললো,— "এই কয় মাসের মধ্যে আপনাদের আগ্রহে আমাদের সমিতি যে কত উন্নতি লাভ করেছে একথা নিশ্চয়ই আপনারা সকলে স্বীকার করবেন। এখন আমার ইচ্ছে, আমরা সকলে মিলে আর একটী প্রধান কাজ এরই সঙ্গে যুক্ত করে নিই, আশা করি এ বিষয়ে আপনাদের সমর্থন পাবো আমি—"

শাখা-সম্পাদিকা বললেন, "নিশ্চয়ই সমিতির যত প্রসার হয়, আমাদের কাজকর্মের ততই সার্থকতা"; অন্যান্য সভ্যারা সমর্থনসূচক মাথা দোলাতে ক্ষমা বললো, "আপনারা অনেকে নিশ্চয়ই কুলী রমণীদের সম্বন্ধে জানেন,—কী বিষাক্ত আবহাওয়ার মধ্যে তাদেঁর জীবন যে নিরন্তর অতিবাহিত হয়! তাই তাদের সে নরককুণ্ড থেকে মুক্ত কোরে উন্নত করা আমাদের এখন থেকে কর্মজীবনের অন্যতম একটী ব্রত হবে,— আপনাদের কারও আপত্তি নেই তো?"

"না,—এ বিষয়ে আমরা সকলে একমত আছি" সভ্যা কর্মীরা বললেন, "এ সম্বন্ধে আমাদের কী কাজ করতে হবে, আপনি একটু বলে দেবেন।"

"নিশ্চয়ই, বলে দেব বই কি" খুসীমুখে ক্ষমা বললো,—"নিন্ তো মিসেস্

বন্ধু আপনি প্রত্যেক কর্মীর জন্য ভিন্ন কোরে কার্যতালিকা তৈরী করে ফেলুন, —আমি বলি আপনি লিখুন—”

ঠিক এই সময় একজন বয়স্কা নূতন সভ্যা ক্ষমাদের টেবিল ধরে এসে দাঁড়ালেন। যেন তিনি অভিযানে নেমেছেন,—মুখের ভাব তাঁর এমনই উদ্ধত। সম্প্রতি তাঁরা এ অঞ্চলে বদ্‌লী হয়ে এসেছেন এবং কয়েকদিন পূর্বে একটী কর্মী মেয়ে তাঁকে সভ্যা শ্রেণীভুক্তা করেছেন, আজ তিনি প্রথম সমিতিতে যোগদান করলেন। নাম সুহাসিনী মিত্র।

তাঁর দিকে তাকিয়ে শাখা-সম্পাদিকা জিজ্ঞেস কর্‌লেন,—“আপনি কিছু বলতে চান্ বুঝি ?”

“বলবো আর কী, সব সময় কি সব কথা বলা যায় নাকি ?”

“না—না বলুন না, আজ তো আপনাদেরই বক্তব্য শোন্‌বার আমাদের দিন”—

“না এই বলছিলুম,—সমিতির এই পরিচালনা কার্যে কোনও আদর্শের যোগ আছে কি ?”

“নিশ্চয়ই, মেয়েদের শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে উন্নত করে তোলা কি একটা বিরাট আদর্শ নয় ?”

“কিন্তু জানেন, রথের সারথী যদি আদর্শ-ভ্রষ্ট হয়, সে রথ কখনো স্বর্গে পৌঁছে না, নরকেই তার গতিবিধি হয়—”

“তার মানে ?”

“মানে এই সমিতির পরিচালিকা যিনি, অর্থাৎ আপনাদের সারথী, কর্ত্তৃ,—সেই জাতীয় মেয়ের হাতে কখনও নারী চরিত্র উন্নত হতে পারে না, বরং অবনতি হয় তাদের,—জানেন ওর জীবনী আপনারা ? কলেজে পড়তে পড়তে ও কোথায় যেন পালিয়ে গেছ্‌লো। পরে জানা গেল রেঙ্গুনে এক

শিখের সঙ্গে ঘর করছে,—সম্প্রতি আবার তার ঘরও ছেড়েছে নাকি, উনি কাগজ পড়ে বলছিলেন—”

উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠে শাখা-সম্পাদিকা বললেন,—“আপনি ভুল করছেন মিসেস্ মিত্র, ইনি বিখ্যাত ব্যারিষ্টার পি, এন মুখার্জির মেয়ে, ক্ষমা দেবী, এখনও বিয়ে হয়নি—”

“আমি ভুল করছি বৈকি,—” ব্যঙ্গের কণ্ঠে সুহাসিনী বললেন, “ওর নাড়ী নক্ষত্র, রক্তের খবর জানি আমি, ও আমার খুড়শ্বশুরের শালীর মামাতো বোন্, জিজ্ঞেস করুন না ওকে—” তখন সভার প্রত্যেকটী মহিলা বিস্ময়ের চোখ মেলে ক্ষমার বিবর্ণ মুখের ম্লান দৃষ্টির দিকে তাকাতে এ বিষয়ে তাঁদের আর কিছু সন্দেহ রইলো না। তাঁদের ঠোঁটের রেখায় ঘৃণার ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো।

ঠিক সেই সময় সুজিতের ভৃত্য এসে ক্ষমাকে বললো,—“বাবুজি আপনাকে সেলাম জানিয়েছেন, জরুরী কাজ আছে—”

যেন জালে শরবিদ্ধ পাখী আকস্মিক মুক্তি পেয়ে গেল, এমনি ত্বরিৎ পায়ে ক্ষমা কোনও দিকে না তাকিয়ে ভৃত্যকে অনুসরণ কোরে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সুজিৎ ওর বাঙ্গলোয় ত্রাস্ত হাতে সুটকেশ বেডিং প্রভৃতি গোছগাছ করছিল, ক্ষমাকে দেখে উদ্বিগ্নমুখে বললো,—“জানো ক্ষমা আমার বাবার ভয়ানক অসুখ, আমাকে এখুনি বাড়ী যেতে হচ্ছে।”

“আমি যাবো তোমার সঙ্গে সুজিৎ—”

“সে কী, তোমার কাজকম রয়েছে ক্ষমা—”

“কাজ আমার ফুরিয়ে গেছে সুজিৎ—” বিকৃত ঠোঁটের ভঙ্গিতে একটু

মলিন হেসে ক্ষমা বললো—"একটা অসৎ চরিত্রের উচ্ছৃঙ্খল মেয়ের, সতী লক্ষ্মী মেয়েদের নিয়ে কারবার কোরে তাদের আদর্শ-ভ্রষ্ট করবার কোনও অধিকার নাই।"

কিছু না বুঝতে পেরে সুজিৎ শুধু আশ্চর্যের চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। তখন ক্ষমা ওকে পূর্বোক্ত ঘটনাগুলির ইতিবৃত্ত বলতে সে কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধভাবে কী যেন চিন্তা কোরে শুষ্ক গলায় বললো, "তুমি তো আগেই জানতে ক্ষমা, এদের সমাজে মানুষের চোখে, মানুষের বাইরের পরিচয়টাই বড়—দুঃখ কোরনা, পথ তোমার ঈশ্বর বলে দেবেন; কিন্তু আমি যে ঢাকা যাচ্ছি—তুমি যাবে কোলকাতা—"

"তাতে কী, চলো, একসঙ্গে কাউনিয়া পর্যন্ত যাওয়া যাবে, তারপর আমরা দু'জনে দু'দিকে চলে যাবো।" গাড়ীর সময় প্রায় হয়ে গেছলো, ক্ষমা ওর জিনিষপত্র গোছগাছ করতে চলে গেল।

* * * *

পরদিন বিকেলবেলা, শাখা-সম্পাদিকা সমিতি কক্ষে সভ্যাদের সমাবেশে একটী সভার অনুষ্ঠান কোরেছিলেন। এই সভায় প্রধান কার্যালয়ের প্রধান সম্পাদিকাকে সভ্যাদের স্বাক্ষর-যুক্ত কোরে পত্র দ্বারা জানানো হবে—"তাঁরা যদি সৎচরিত্রের উন্নত বংশের মহিলা কর্মী পাঠাতে পারেন, তবে তাঁরা সংশ্লিষ্ট থাকতে পারবেন—; কেন না ক্ষমার মত আদর্শ-ভ্রষ্ট কর্মীর সংস্পর্শে থাকা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়।" অভিজ্ঞা যে সভ্যারা জানেন এ সভার আলোচনার বিষয়বস্তু কী, তাঁরা সভায় যোগদান করেননি। যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের লক্ষ্য কোরে শাখা-সম্পাদিকা পত্রের খসড়াখানি পড়বার উদ্যোগ করতে, ডাক পিওন দরজায় দাঁড়িয়ে বললো,—"সমিতির সেক্রেটারী

মিসেস্ বসুর নামে 'তার' আছে।" 'তার'খানা হাতে নিয়ে কোনও অজানা বিপদের আশঙ্কায় মিসেস্ বসুর মুখটা শুকিয়ে উঠলো, অসহায়ের একটা করুণ দৃষ্টি নিয়ে তিনি ওই হলদে রঙের কাগজের বুকে আঁকা কারবোন কপির দিকে তাকিয়ে রইলেন। একজন সভ্যা বললেন,—"রমা রায়কে খবর দিলে হয়, তিনি এসে একবার 'তার'টা পড়ে দিয়ে যাবেন।"

পিওন তাঁদের কথাবার্তা শুনে বললো, "আমার দেরী হয়ে যাবে অতক্ষণ দাঁড়াতে,—দিন আমি পড়ে দিচ্ছি।"

মিসেস্ বসু কম্পিত হাতে 'তার'টা তার হাতে দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ বাবা তাড়াতাড়ি তুমি পড়ে বলো কী খবর আছে ওতে—"

পিওন টেলিগ্রামখানা পাঠ কোরে যা বললো, তার মর্ম এই—, সমিতির প্রধান কার্যালয় থেকে কৃষ্ণা চৌধুরী জানিয়েছেন—"ক্ষমা আজ দুপুরের মেলে ওখানে পৌচেছে, তাঁদের জানিয়ে আস্‌বার সে অবসর পায়নি। এখন কিছুদিনের মত সমিতি বন্ধ থাকবে, কারণ তাঁদের উপযুক্ত কর্মী পাওয়া একটু কঠিন।"

পিওন অনেকক্ষণ সই নিয়ে চলে গেছে তবুও সমিতিকক্ষ তখনও নিস্তব্ধ; প্রত্যেকের বাকশক্তি অবলুপ্ত, নীরব অধরপ্রান্ত বিস্ময়ে একটা ঘোর প্রগাঢ় হয়ে উঠেছে। কিছুক্ষণ পর শাখা-সম্পাদিকা বল্লেন—, "আর কিসের টানে থাকবে—সেক্রেটারীই যখন চলে গেল—"

তাঁকে সমর্থন কোরে সভ্যা সুহাসিনী মিত্র বললেন, "ধন্য যাহোক্ সব ধড়ীবাজ মেয়ে—" তাঁর বলার একটা অদ্ভুত হাস্যকর ভঙ্গিমায় অন্যান্য সভ্যারা উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন—ঘরের মধ্যে সেই শ্লেষের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়ে ঘুরতে লাগলো।

"কঙ্কন"

"নাঃ আর ভালো লাগে না, সত্যি আর ভালো লাগে না, অসহ্য"; ষোল বছরের মেয়ে রাণু কিছুতেই বুঝতে পারে না, আজকে কেন সে মনের ভিতরে একটা নিবিড় রিক্ততা শূন্য মরুভূমির মতই অনুভব করছে। ওর কিসের অভাব? ধনী বাপের একটীমাত্র মেয়ে সে—, ওর গায়ে ব্যথার আঁচড়টী লাগতে পারবে না বলে, ওর দাদা ওকে নিজের কর্মস্থলে এনে রেখেছেন।

তবে? হ্যাঁ তবে, না না যাক্ সে কথা, তা'তে হয়েছে বা কী, ওর বয়সের এমন কত মেয়েতো এখনও ফ্রক পরেই ঘুরে বেড়ায়। বছর দেড় পূর্বে কয়েক মাসের জন্যে ওকে না হয় সিঁথিতে সিঁদূর, হাতে নোয়া এবং শাঁখা পরতে হয়েছিল বলেই আজ ওকে শাড়ী পরতে হচ্ছে। সে শাড়ী এখন সাদা অথবা রঙিন হোক্—, পাড় থাকু অথবা নাই থাক্। কিশোরী রাণুর বুকের তল গাঢ় একটী নিশ্বাসে ভারী হ'য়ে উঠলো।

সেদিন দুর্গোৎসবের বিজয়া তিথি। তখন সন্ধ্যার আবছা আলো দিগন্তর বুকে ক্রমশঃ ধূসর হয়ে নামছে, সুদূর নদীর প্রান্ত হতে অস্পষ্ট শব্দে দেবীর বিদায় বাজনার করুণ সুরের রেশটী ভেসে আসছে, বাড়ীর ছেলেদের নিয়ে রাণুর দাদা ভাসান দেখতে গিয়েছেন। রাণু সংসারের টুকিটাকি কাজগুলো সেরে, গা হাত ধুয়ে নিজের ঘরে এসে অনেকক্ষণ ঢুকেছে। হ্যাঁ এখুনি বিজয়ার প্রণাম, প্রীতি স্নেহ, শ্রদ্ধা প্রভৃতি আদান

প্রদান করতে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবরা এসে পড়বেন, ওকে একখানা পরিষ্কার কাপড় যে পরতে হবে। কিন্তু সেই কাপড়খানা পরবার ওর আগ্রহ উৎসাহ কই ? প্রায় মিনিট কুড়ি অতিক্রম ক'রেছে, ও ঘরে এসে তোড়ঙ্গর ঢাকা খুলে বসে আছে, কোলের উপর ওর একগাছা নানারূপ পুঁথির কারুকার্য করা রংচঙে কাঁচের কঙ্কন পড়ে রয়েছে। মন বোধহয়, কোথায় কতদূরে স্মৃতিরসায়রে ভাস্‌তে ভাস্‌তে চলে গিয়েছে।

বাঙ্গালীর হিন্দুসমাজে স্বামীর খোলাখুলিভাবে স্ত্রীকে কিছু উপহার দেওয়াটা এখনও বেহায়াপনা লজ্জাহীনতা ইত্যাদির পরিচয়। তা সত্ত্বেও গত বৎসরের এই দিনটীতে সুপ্রিয় কত না গোপনে, কত না আগ্রহে, কত না স্নেহের সঙ্গে এই কাঁকন জোড়াটা নববধূ রাণুর হাতে এনে পরিয়ে দিয়েছিল।

মৃদু অনুযোগের সঙ্গে রাণু বলেছিল—"তুমি এখন কলেজে পড়, কেন এত খরচ করলে বলত" ?

সুপ্রিয় বলেছিল,—"বা রে আমার বুঝি তোমাকে আজকের দিনে কিছু দিতে ইচ্ছে করে না—" ?

রাণু আর কিছু বলেনি শুধু প্রাণের সব ভালোবাসা উজাড় ক'রে স্বামীকে একটী প্রণাম করেছিল। এর প্রত্যুত্তর স্বরূপ সুপ্রিয় ওকে কাছে টেনে নিয়ে—রাণু আর ভাব্‌তে পারলো না, মধুর সেই স্মৃতির মদির একটা আবেশে ওর দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো, গভীর তৃপ্তির সঙ্গে ও মুহূর্তের জন্যে চোখদুটী মুদ্রিত করলো। পুনরায় চোখ খুলে কঙ্কন জোড়াটা কোল থেকে তুলে নিল—, অতীতের সেই চলে যাওয়া দিনের স্বপ্নসুন্দর দিনটীকে সে কী আবার কল্পনার আলোয় ফিরিয়ে আন্‌তে পারে না ?

রাণু ভাব্‌লো, "কেন পারে না? নিশ্চয়ই পারে। সে একগাছা কঙ্কন হাতে গলাতে গেল কিন্তু পারলো না, চিরন্তনী সংস্কার ওর মনের মধ্যে সাপের মত ফণা তুলে দাঁড়াল। সে যে বিধবা একথা তো তাকে ভুল্‌লে চল্‌বে না, স্মৃতির সম্মান রক্ষা করার চেয়ে বৈধব্যের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখাই যে ওর এখনকার জীবনের শ্রেষ্ঠতম কাজ। রাণুর ইচ্ছে করলো কঙ্কন জোড়াটা ছুঁড়ে ভেঙ্গে ফেলে দেয়। ঠিক সেই সময় ওর দাদার বারো তেরো বছরের মেয়ে বুলু কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে তার কাছে এসে দাঁড়ালো।

"কী হয়েছে রে কাঁদ্‌ছিস কেন"? রাণু ওকে সস্নেহকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো।

"দেখনা পিসিমা, মা আমায় এখন বল্‌ছেন অমিয়াদের সঙ্গে বিজয়ার দেখা শুনা ক'রে আয় গিয়ে; কিন্তু অমিয়ার মত কাঁকন বাবা আমায় কিনে দিলেন না; বল্‌লেন, ও সব বাজে খরচ তিনি করতে পারবেন না, কিন্তু আমি এখন ওদের বাড়ী যাই কী ক'রে বলত? গেলেই সবাই আমাকে কাঁকনের কথা জিজ্ঞেস করবে। এখানকার প্রায় সব মেয়েই কিনেছে—" বলতে বলতে বুলু আরও ডুক্‌রে ডুক্‌রে কেঁদে উঠলো।

রাণু কয়েকমুহূর্ত ওর অশ্রুভেজা মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, হঠাৎ মনে হোল ও যেন ওই ব্যর্থ কাঁকন জোড়ার সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে। ও নিজের আঁচল দিয়ে বুলুর ভিজে চোখ মুছিয়ে দিয়ে, পরম যত্নের সঙ্গে নিজের কাঁকন জোড়া হাতে তার পরিয়ে দিতে দিতে বললো—"এ জোড়া আজকের দিনে তোর পিশেমশাই আমায় দিয়েছিলেন বুঝ্‌লি—, এর অনাদর করিস্‌নে, মিছে বাক্সে আমার পড়েই থাকবে—ব্যবহার করিস কেমন—"? বর্ষার পর শরৎশ্রীর নূতন আলোয় বুলুর মুখটা আনন্দে

ঝলমলে হয়ে উঠলো, ওর সেই উৎফুল্ল মুখের দিকে রাণু কয়েকমুহূর্ত তাকিয়ে থেকে অন্যদিকে মুখটা ফিরিয়ে নিল। সন্তর্পণের সঙ্গে একটা নিশ্বাসও ফেললো সে।

অনেকক্ষণ, প্রায় মিনিট কুড়ি, বুলু রাণুর ঘর থেকে চলে গিয়েছে, কিন্তু রাণু তখনও মেঝেয় বসে, ওর বাক্সের ডালা তেমনি খোলা রয়েছে। তখনও যে সে কী ভাবছে সেকথা সেই জানে।

হঠাৎ নীচে থেকে বউদির উত্তপ্ত কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে ওর চিন্তার তার কেটে গেল, সে দ্রুত পায়ে নীচে নেমে এসে দেখলো, বউদি যেন অগ্নিমূর্তি ধারণ ক'রে তিরস্কার করছেন, বুলু ম্লানমুখে সেখানে দাঁড়িয়ে, হাত দিয়ে রক্ত ঝর্ঝর্ ক'রে ঝরছে, তার দেওয়া কঙ্কন জোড়াটা ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ মেঝেয় পড়ে রয়েছে। একটু আশ্চর্যভাবে সেই-দিকে তাকিয়ে রাণু বল্লো—, "কী হয়েছে বউদি ওকে বকছো কেন" ? "হবে আর কী ? হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু—" কণ্ঠে সপ্ততন্ত্রীর ঝঙ্কার তুলে বউদি বললেন, "ও না হয় ছেলে মানুষ জানে না, তুমি আজকের বচ্ছরকার দিনে কী'ব'লে তোমার হাতের বালা ওকে পরিয়ে দিলে বলত ? নিজের কপাল পুড়িয়ে আশ মিটলো না—, তাই ওকেও দলে টানতে চাইছ ?

কয়েকমুহূর্তের জন্যে রাণু স্তম্ভিত হয়ে গেছলো। কেন সে তার অভিশপ্ত হাতের জিনিষ নবীনা এক কুমারীকে দিতে গেছলো ? কিন্তু সে যাকে ভালোবাসে, তারই স্নেহের দান যে কখনও অপবিত্র হতে পারে এ ধারণা যে তার অভিজ্ঞতার বাইরে ছিল। পরমুহূর্তেই রাণু নিজেকে স্বাভাবিক ক'রে নিয়ে ঠোঁটের রেখায় একটু মলিন হাসি টেনে

বল্‌লো, "ওকে আর বোকনা বউদি, ভুল আমার হয়ে গেছলো ; না জানার ভুলের দোষ ওকে ছুঁতে পারবে না তুমি দেখো—" ঠিক সেই সময় ওর দাদা ছেলেদের নিয়ে ভাসান দেখে ফিরে আস্‌তে ও বিজয়ার মিষ্টিমুখের খাবার গোছাতে ভাঁড়ার ঘরে চলে গেল। চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে বুলু ওকে অনুসরণ করলো। ভাঁড়ারে গিয়ে রাণু পাথরের গাত্রে সিদ্ধিগোলা, কাঁসার রেকাবে নিমকী, সিঙাড়া, নারিকেলছাবা, গজা প্রভৃতি থরে থরে সাজাতে লাগ্‌লো। এখুনি আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবরা এসে পড়বে। ওকে সাহায্য করতে করতে বুলু বল্‌লো—, "আমার থালায় তোমার খাবারগুলো তুলে রাখো পিসিমা, হৈ হৈ মিট্‌লে এক সঙ্গে খাবো আমরা—"

মৃদু হেসে রাণু বল্‌লো—"এ যে বাজারের খাবার, আমার তো খেতে নেই বুলু—"

তুমি খাবে না, কাল যে আবার তোমার একাদশী, তখন বল্‌ছিলে—"

"তা হোক্‌গে, তুই শোন্ বুলু "গলার স্বর নিম্ন ক'রে রাণু বল্‌লো—, "তুই যা তো চুপি চুপি উঠোন থেকে ওই চুড়ির ভাঙ্গা কাঁচগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আয়, পারবি তো—" ?

"খুব পারবো পিশিমা—, মা তো এখন বাবার সঙ্গে ঘরের মধ্যে গল্প করছেন—"

চঞ্চল পায়ে বুলু ঘর থেকে ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল।

অভিমান

এলাহাবাদ থেকে বসন্তবাবুর আবাল্যের বন্ধু মণিবাবু লিখেছেন—

"ভাই সু,

অনেকদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি, আর ভাই চাকরী করতে করতেই হাড় হোল ভাজা, ভাজা,—তাদের আবার বন্ধুপ্রীতি? তাদের আবার আনন্দ। আমার ছেলে মেয়ে দুটী বড়দাদার কাছে শিলং পাহাড়ে বেড়াতে যাচ্ছে, দীর্ঘ পথের যাত্রায় ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তোমার কোয়াটার্সে একদিন রেখে পরের দিন সকালে ষ্টীমারে তুলে দিও। সেইরকম বড়দাকেও লেখা রইলো, তিনি আসবেন শিলং ষ্টেশনে।" বসন্তবাবু রেল কোম্পানীর একজন প্রবীণ চিকিৎসক, আমিনগাঁও ষ্টেশনের উপরেই তাঁর সুসজ্জিত বাঙ্গলোখানি। বহুদিন পর অন্তরঙ্গ এক সুহৃদের পত্রখানি পেয়ে মনটা তাঁর আনন্দের প্রাচুর্যে আপ্লুত হয়ে উঠলো, হাসিমুখে স্ত্রীকে গিয়ে বল্লেন, "শুনছগো, কাল সকালবেলা মণির ছেলে মেয়ে অশোক আর মীরা আস্‌ছে বেড়াতে—"

"সত্যি তাই নাকি, এলাহাবাদের মণি বোসের ছেলে মেয়ে বুঝি"? স্ত্রী নীলিমা তরকারী কুটছিলেন, তা স্থগিত রেখে বল্লেন, "প্রায় দশবছর ওদের সঙ্গে দেখা হয়নি,—ছেলে মেয়ে দুটী নিশ্চয়ই বেশ বড় হয়েছে"?

সঙ্গোপনে

বসন্তবাবু বল্লেন "বড়তো হবেই—' ছেলেটী বুঝি এবার এম-এ দিয়েছে, মেয়েটী পড়ে ফাস্ট ইয়ারে—"

"মীরা তো ঠিক আমাদের সুষমারই সমবয়সী" নীলিমা দেবী বল্লেন। ওইখানে সতেরো আঠারো বছরের একটী খঞ্জ মেয়ে বসেছিল, তারই নাম সুষমা, এই দম্পতীর সে একটীমাত্র মেয়ে। বাপ মার কথাগুলি শুনে, সুষমা মনের নিভৃতপ্রান্তে বেশ একটা আনন্দ অনুভব করলো, অসীম আগ্রহে ওর ব্যথিত চোখের ম্লান দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ও খোঁড়া মেয়ে, ওই কদর্য পা নিয়ে কোথাও বড় একটা যেতে পারে না, কোনও আনন্দ উৎসবে যোগদান করতে পারে না, বন্দী জীবনের আবর্তে ওর বঞ্চিত আত্মা নিষ্পেষিত হওয়াই ওর লাঞ্ছিত ভাগ্যের যোগ্যতর পাওনা—তাই বুঝি বাপ মার কথাগুলো ওর একটানা জীবনে আন্লো একটা বৈচিত্র—, লোভনীয় করে তুল্লো রিক্ত মনটাকে।

ওর একটী পা নেই—, হাঁটে লাফিয়ে লাফিয়ে, পরম উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে এসে বাপের হাত থেকে সদ্য আসা পত্রখানি নিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে, কতবার যে চিঠিখানা পড়লো, তার ঠিক নেই। ওর মীরাকে একটু একটু মনে পড়ে, কী সুন্দর দেখতে, এখন নিশ্চয়ই আরও ভাল হয়েছে, আই-এ পড়ে,—একদিন একটা চমৎকার ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়ে যাবে—সুষমার বুকটা মথিত করে, একটা গাঢ় দীর্ঘশ্বাস ঝরে পড়লো। মনটা সংযত করে ও আবার চিঠিটা পড়লো এবার ও যেন একটু চঞ্চল হয়ে উঠলো। অশোকদা আসবে, কেন, সে কেন আসবে? একটা কুণ্ঠিত মন নিয়ে সুষমা ভাবলো, "সে না

এলে কিন্তু বেশ হোত—, ও তার এই খোঁড়া পা নিয়ে তার সুমুখে কী করে বের হবে? লজ্জামাখানো চোখে ও একবার নিজের উন্নত বক্ষের দিকে তাকিয়ে কেঁপে কেঁপে উঠলো, কেন তার পঙ্গুজীবনে এই মাতৃত্বের ব্যর্থতা? সে যখন "মা" হতে পারবে না, একটা খোঁড়া মেয়েকে কেউ যখন সাধ করে চায় না জীবনসঙ্গিনী করতে, তখন কেন মিছে ওর এ মাতৃত্বের বিড়ম্বনার প্রয়োজন? ও যখন লাফিয়ে হাঁটবে, ওর সমস্ত দেহ দুলবে, আর অশোক হয়তো বা সেইদিকে হঠাৎ তাকিয়ে ফেলবে—, না না ও তার সুমুখে কিছুতেই বের হতে পারবে না—

এমনি চিন্তার ঘন-জালে সুষমা ক্রমশঃ নিবিড় হয়ে জড়িয়ে রইল।

পরদিন সকালবেলা বসন্তবাবু বন্ধুর ছেলে মেয়ে দুটীকে আনতে ষ্টেশনে গেছ্লেন, অশোককে তাঁর বাঙ্গালোয় পৌঁছে দিয়ে তিনি হাসপাতালে চলে গেলেন। নীলিমা দেবী দাঁড়িয়ে ছিলেন বারান্দায়, স্নেহহাস্যে অশোশকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে বল্লেন—"যাহোক্ এতদিন পর কাকীমাকে মনে পড়লো, কিন্তু একা যে, মীরা কই—"? সহাস্যে তাঁকে একটী প্রণাম করে একখানা বেতের চেয়ারে বসে অশোক বল্লো, "ওর ভাগ্য খারাপ কাকীমা, তাই আস্তে পারলো না, আসার কয়েক ঘণ্টা আগে ওর জ্বর এসে গেল—, এই দেখুন না সুষমার জন্য কী সব আন্বে বলে ঠিক করেছিল, আমার ঘাড়ে সব বোঝা চাপালো—"অশোক নীলিমা দেবীর দিকে একটা বেতের বাক্স এগিয়ে দিয়ে আবার বল্লো —সুষমা কই কাকীমা, মীরা একটা নূতন কি খাবার করতে শিখেছে, সুষমাকে দিয়েছে সেটা; কিন্তু তাকে এখুনি খেতে হবে—, তা'নাহলে গন্ধ হয়ে যাবে"।

সুষমা তখন ঘরের ভিতরে একটা জানালার আড়ালে দাঁড়িয়েছিল, মানুষ যে এত মধুর করে কথা বল্‌তে পারে ওর অনাদৃত জীবনে এই বুঝি সে প্রথম শুনলো চেহারার সঙ্গে মানুষের স্বভাবের কি সামঞ্জস্য অশোকের টানা দুটি চোখের দিকে তাকিয়ে সুষমা ভাব্‌লো। হঠাৎ অশোক চোখ তুলে ঘরের মধ্যে তাকাতে ও জানালা থেকে ফস্‌ করে সরে গেল। নীলিমা দেবী বললেন—, "যে লাজুক মেয়ে সুষমা, তোমরা আসবে বলে ওর কত আগ্রহ, রাত্রি থাক্‌তে ঘড়িতে য়্যালার্ম দিয়ে উঠেছে, আর তার এখন দেখাই নেই—কোথায় গেলিরে সুষমা, অশোকদা এসেছে, প্রণাম কর এসে"। একটু চুপি চুপি গলার স্বর নিম্ন করে তিনি বললেন, "পা-টা সেই রকমই আছে কীনা তাই কারুর সাম্‌নে বেরুতে চায় না। নাও তুমি এবার মুখ হাত ধোও, দুপুরে আবার গল্প হবে, আমি তোমার চায়ের জোগাড় করি, ওই দেখ ওই দিকে বাথরুম"।

নীলিমা দেবী ত্রস্তপায়ে চায়ের উদ্দেশ্যে চলে গেলেন, অশোক কিন্তু স্নানের ঘরে যেতে পারলো না, "ওর পা-টা সেই রকমই আছে কিনা—" নীলিমা দেবীর এই কথাগুলি ওর কানের মধ্যে ঘুরেফিরে বাজতে লাগলো, সহানুভূতির আর্দ্রতায় ওর অন্তর ভরে উঠ্‌লো, একটা নিশ্বাসও বুঝি ঝরে পড়লো। ও বুঝেছিল যে মেয়েটী ম্লানমুখে জানালার ধারে দাঁড়িয়েছিল, সেই সুষমা, আবার চোখ তুলে ঘরের মধ্যে তাকালো, কিন্তু এবার ওর দৃষ্টি ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল।

*   *   *   *

অশোকের একান্ত জেদে সুষমাকে ওর সামনে বেরুতে হয়েছিল। তার কারণ মীরা অশোককে বিশেষ করে বলে দিয়েছিল—, সুষমা কী রকম দেখতে হয়েছে, তার পা বাঁধানো হয়েছে কিনা সব খবর তাকে ঠিকমত ফিরে এসে বলতে হবে। আকস্মিকভাবে মীরার বেড়ানোটা বন্ধ হয়ে গেল বলে অশোকের মনে বেশ একটু দুঃখ ছিল, তাই সে তার স্নেহের বোনটার অনুরোধ পালন করতে রীতিমত উৎসুক হয়ে উঠেছিল। তবে লাজুক সুষমা, ওর বিপর্যস্ত দেহসম্ভার নিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে অশোকের সুমুখে আস্‌তে পারেনি। তখন দুপুরবেলা, খাওয়াদাওয়ার পর বারান্দায় বসে বসন্তবাবু অশোকের সঙ্গে গল্প করছিলেন, এমনি সময় নীলিমা দেবী এসে বললেন, "অনেক করে রাজী করেছি বাবা সুষমাকে—ওই দেখ ওই ঘরে ও আছে—, একটু গল্প-সল্প করে নাও এলে তো ঘোড়ায় যেন লাগাম দিয়ে, কাল সকালেই তো চলে যাবে—"

অশোক বলে উঠলো—"আমার আরও ক'দিন থাকার খুব ইচ্ছে ছিল কাকীমা, কিন্তু জেঠামশাই বুড়ো মানুষ, সেই পাহাড় ভেঙ্গে ষ্টেশনে এসে আবার ফিরে যাবেন—" "ফেরবার সময় কিন্তু বেশী দিন থাকতে হবে এখন থেকে বলে রাখছি—" নীলিমা দেবী বললেন।

"সে আমি এখন থেকেই রাজী" বলে অশোক হাস্‌তে হাস্‌তে ঘরে যেয়ে ঢুক্‌লো। ঘরের ভিতরে একখানা চেয়ারে সুষমা বসেছিল, মুহূর্ত্তে ওর অপাঙ্গ নিরীক্ষণ করে নিয়ে একখানা তক্তোপোষের উপর বসে অশোক বললে—"এই সেদিনের মেয়ে তুমি সুষমা, এর মধ্যে তোমার এত লজ্জা কেন"? ও স্নিগ্ধ চোখে সুষমার দিকে তাকিয়ে রইলো।

সুষমা এই অমায়িক স্বভাবের ছেলেটার সঙ্গে দুটো কথা বলতে খুবই

উৎসুক হয়েছিল, মীরার সম্বন্ধেও ওর মনে একটা গভীর আগ্রহ ছিল। কিন্তু প্রথমে কথা বলতে ও একটা নিবিড় সঙ্কোচ অনুভব করছিল, পর-মুহূর্ত্তেই নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে ভাবলো, নিতান্ত অনাহূতভাবে এই ছেলেটী তাদের বাড়ী এসেছে, চলে যাবে কালই— এ ক্ষেত্রে ওর কুণ্ঠাই কী বড় হবে? এই সুন্দর, স্নেহময় ছেলেটীর সঙ্গে দুটো কথা বলে, জীবনের একটী ক্ষণকে পুণ্যতিথি করে রাখতে পারবে না, স্মৃতির মণিকোঠায় সঞ্চয় করে রাখার জন্য ও কী কিছুই অর্জন করতে পারবে না? সংসারে বিশ্বশুদ্ধ লোক ওকে ঘৃণা করবে, করবে শুধু অনাদর, মনে করবে সংসারের ও একটা বোঝা—এমন করে কেউ বুঝি আর কোনও দিন ওর সঙ্গে যেচে এসে কথা বলেনি, এবং বলবেও না। হঠাৎ ও অশোকের দিকে তাকিয়ে বলে ফেললো, "অশোকদা তুমি যদি একটা খোঁড়া মেয়ে হতে, একটা পুরুষমানুষের সুমুখে বেরুতে পারতে? একটা সতেরো বছরের খঞ্জ মেয়ের চলার বিকৃত ভঙ্গিমাটা তুমি একবার কল্পনা করে দেখতো—" সুষমার ঠোঁটের রেখায় একটু বেদনার হাসি ফুটে উঠলো। ওর ব্যর্থ বুকের গোপন কথা অশোকের স্নেহের আকর্ষণে বুঝি প্রকাশ হয়ে পড়লো। সহানুভূতির আর্দ্রকণ্ঠে অশোক বললো, "তোমার পা-টা কেন বাঁধানো হয়নি সুষমা"?

মলীন হেসে সুষমা বললো, "আমি তো পুরুষমানুষ নই,—চাকরী করে টাকাও আন্‌তে পারবো না, বিয়ে করে পণ আন্‌তেও পারবো না, আমার প্রতি কার যত্ন থাকবে বল, যে আমার পা বাঁধানো হবে? আমি বেঁচে আছি মাত্র সংসারের একটা বোঝা হয়ে—" সুষমা একজন ব্যথিত শ্রোতা পেয়ে ওর প্রাণের কথাগুলি তাকে নিঃশেষে উজাড় করে শোনাতে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল, কিন্তু অশোক হঠাৎ ওর কাছে এগিয়ে এসে বললো, "দেখি

সুষমা তোমার পা-টা কোন্‌খান্‌ থেকে ভাঙ্গা, আমি ফেরবার সময় কোলকাতায় বাঁধানোর বন্দোবস্ত করবো—"

"না না অশোকদা, সে হয় না, পা আমার একটা মোটেই নেই, কী দেখাবো" সুষমা ত্রস্তে উঠে দাঁড়ালো, ওর গালদুটী তখন গোলাপী হয়ে উঠেছে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটেছে, ও যে খোঁড়ামেয়ে সে কথা ভুলে গিয়ে, একটা পা ঘষ্‌তে ঘষ্‌তে প্রায় ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ওর চলার সেই নৃত্যরত গতির দিকে তাকিয়ে অশোক একটী প্রগাঢ় দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো। ওইখানেই পরিপাটী করে বিছানা পাতা ছিল ও ক্লান্তভাবে মাথাটা একটা বালিশের উপর রাখ্‌লো। দীর্ঘ পথের যাত্রায় চোখে ওর শ্রান্তি মাখোনোই ছিল কয়েকমুহূর্তের মধ্যে তন্দ্রা নেমে এল। কিছুক্ষণ পর যেন কার মৃদুকণ্ঠের সুমিষ্ট ডাকে ওর ঘুম ভেঙ্গে গেল, নিদ্রালুপ চোখ মেলে দেখ্‌লো, ওর মাথার কাছে সুষমা বসে।

সুষমা বললো, "আরও কত ঘুমুবে বলতো অশোকদা? চায়ের সময় যে হয়ে গেল, বাবা তোমার জন্য টেব্‌লে বসে—"

ধড়মড় করে উঠে বসে অশোক চোকদুটী বেশ করে মুছে ফেলে বললো, "খুব ঘুমিয়েছি না সুষমা? কিন্তু তুমি তখন পালিয়ে গেলে কেন বলত? তাহলে বেশ গল্প করা যেতো—"

ওর প্রশান্ত মুখের দিকে মুগ্ধচোখে তাকিয়ে সুষমা বললো, "তোমাকে পা দেখাই কেমন করে? তাই কী হয় কখনও, তুমি যে পুরুষমানুষ, এস চা খাবে, বাবা ব্যস্ত হবেন—"

ওর কথার কোন উত্তর না দিয়ে আন্মনাভাবে অশোক ওকে অনুসরণ

করলো। চা খাওয়ার পর বসন্তবাবু বললেন, "চলো অশোক তোমায় নিয়ে উমানন্দ থেকে বেড়িয়ে আসি—"

"কিসে যাবেন কাকাবাবু নৌকায় তো"? গভীর আগ্রহের কণ্ঠে অশোক বললো, "সুষমা যাবে তো"?

"না, ট্যাং ট্যাং করতে করতে ও কোথায় যাবে", বাবা বললেন, "ও বড় একটা কোথায় যায় না, নেহাৎ দরকার হ'লে পাল্কীতে নিয়ে যাই"।

* * * * *

সন্ধ্যের পর অশোক এবং বসন্তবাবু উমানন্দ থেকে বেড়িয়ে ফিরলেন। নৌকা থেকে নেমে বসন্তবাবু গেলেন ক্লাবঘরে, কারণ একহাত পাশা না খেললে, ক্ষিদে, ঘুম দুই তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অশোক এসে বাঙলোয় গেটের ভিতরে প্রবেশ করলো। সেদিন ছিল বুঝি জ্যোৎস্না ঝরানো শুক্লতিথির এক স্বপ্নসুন্দর রাত্রি—, বসন্তবাবুর বাঙলো থেকে ব্রহ্মপুত্র নদী স্পষ্ট দেখা যায়, চাঁদের আলোয় নদীর সাদা ঢেউগুলো নাচতে সুরু করে দিয়েছে, নদীর ওপারে দেখা যায় ঘন সবুজের বনানী প্রান্তর, তারপরেই পাহাড়—, পাহাড়ের গায়ে গায়ে মন্দিরের শুভ্র চূড়াগুলো যেন মায়া দিয়ে এক স্বর্গ রচনা করেছে। গেটের পরই কালো রঙের কাঁকড় বিছানো পথ বারান্দা পর্যন্ত চ'লে গিয়েছে, দুইপাশে তার নানা রং-বেরঙের এবং সুগন্ধঢালা ফুলগাছ দিয়ে ঘেরা সবুজ রঙের মাঠ, ঘাসগুলো তার সুবিন্যস্তরূপে ছাঁটা। রজনীগন্ধা, গোলাপ আর হাসনুহানার মিষ্টি গন্ধ চাঁদের আলোয় মদির হয়ে উঠেছে, ওদিকে ঘরে তীব্র আলোয় বৈদ্যুতিক বাতী জ্বলছে, রেডিও বাজছে, অশোক ঘরে না গিয়ে মাঠেই

পায়চারী করতে লাগলো। হঠাৎ এক সময় ও দেখ্‌লো হাসনুহানার ঝাড়ের পাশে কে যেন বসে রয়েছে, ও এগিয়ে গিয়ে বললো, "একী সুষমা তুমি যে—, একা এখানে—"

উঠে দাঁড়িয়ে সুষমা বললো—, "আমি রোজ এমনি সময় এখানেই থাকি অশোকদা, কাজকর্ম সেরে আর বাড়ীর মধ্যে ভালো লাগে না, তুমি উমানন্দ বেড়ালে? কালই তো ভোরবেলা চলে যাচ্ছ—; আবার আসবে তো—"?

অশোক অনুভব করলো, সুষমার শেষ দিক্‌কার কথাগুলো যেন প্রগাঢ় হয়েই থেমে গেল, কণ্ঠস্বর অশ্রুরুদ্ধ।

স্নেহের কণ্ঠে অশোক বললো—, "তুমি আমাদের বাড়ী যাবে সুষমা, চলনা আমি তোমায় নিয়ে যাবো—"

মুহূর্ত্তে সুষমার মুখটা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো, বললো—সত্যি আমায় নিয়ে যাবে তুমি অশোকদা—, আমি যাবো তোমার সঙ্গে—; নিঃসঙ্গ বন্দী-জীবন যাপন কর্‌তে কর্‌তে অনাদর আর উপেক্ষা সইতে সইতে হাঁপিয়ে উঠেছি, তুমি আমায় মুক্তি দিতে পারবে কী"? একটু থেমে ম্লানকণ্ঠে সুষমা বললো, কিন্তু জ্যেঠামশাই বা কেন একটা খোঁড়া মেয়েকে বাড়ীতে স্থান দেবেন বল? তিনিও মনে করতে পারেন, একটা বোঝা এসে জুটলো—"

"না—না তিনি তা মনে করবেন না—" প্রগাঢ় প্রীতির সঙ্গে সুষমার একখানা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে অশোক বললো, "আমি তোমাকে বিয়ে করে বউ করে বাড়ী নিয়ে যাবো—, সব স্বামী যেমন করে সব স্ত্রীর সব দায়িত্ব গ্রহণ করে, আমিও সেইভাবে তোমাকে গ্রহণ করবো।

বোঝা তো অনেক দূরের কথা, আমার মনে হয় সংসারে একমাত্র তুমিই আমার জীবনটা হাল্কা হাওয়ায় স্বচ্ছ করে তুলতে পারবে—"।

সুষমা তার এই মুকুলিত জীবনে প্রথম প্রীতি-সম্ভাষণে, রোমাঞ্চিত অন্তরে কেঁপে কেঁপে উঠলো, চোখ তুলে আর সে অশোকের দিকে তাকাতে পারছিল না। তার হাতের বাঁধন থেকে নিজের মুঠিটা খুলে নিয়ে ছুটে পালিয়ে যাবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু তাও সে পারলো না বরং অশোকের আরও কাছে সে সরে এসে, মাথাটা কাত করে তার কাঁধের উপর রাখলো। সংসারে এমন নির্ভরের এমন দুঃখ ভোলানো যে একটি স্নেহ-স্নিগ্ধ স্থান থাক্‌তে পারে, এই কথা মনে করে সুষমার অনুরাগ-সঞ্চিত অন্তর সরমে রঞ্জিত হয়ে উঠলো।

ঠিক সেই সময় বারান্দা থেকে নীলিমা দেবী গম্ভীর গলায় বললেন, "সুষমা এদিকে এস, ঠাকুর কড়া চড়িয়ে বসে আছে, লুচিগুলো বেলে দাও—" তারপরেই তিনি কণ্ঠস্বর নীচে নামিয়ে মিষ্টস্বরে বললেন, "অশোক কখন ফিরলে বাবা ? আমি সেই থেকে যে রেডিও লাগিয়ে বসে আছি, তুমি শুন্‌বে বলে—, এস ভালো প্রোগ্রাম আছে—"

ওরা দুজনে মুক্ত হয়ে দুদিক দিয়ে বাড়ীর মধ্যে চলে গেল, নীলিমা দেবীর আদেশ পালন করতে।

* * * *

পরদিন ষ্টীমার ছাড়বার অনেক আগেই অশোক ঘুম থেকে উঠলো ওর ইচ্ছে সুষমার সঙ্গে একবার দেখা করবে। কিন্তু সারা বাড়ী তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সে তার দেখা পেলোনা, রান্নাঘরে নীলিমা দেবী ওর খাবারের

বন্দোবস্ত করছিলেন। কালকের রাত্রের ঘটনাকে ও মন থেকে জোর করে দূরে সরিয়ে দিয়ে প্রায় একরকম মরীয়া হয়েই জিজ্ঞেস করলো—, "কাকীমা সুষমা কোথায় ওকে তো দেখতে পাচ্ছি না—"

মা বললেন, "যে লাজুক মেয়ে আবার হয়তো কোথাও পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে কে জানে—"

ঘণ্টা দু'একের মধ্যে অশোকের যাত্রার সময় ঘনিয়ে এল, কিন্তু সুষমার দেখা পাওয়া গেল না, যথাসময়ে বিদায়পর্ব শেষ করে ষ্টীমারের উদ্দেশ্যে অশোক বেরিয়ে পড়লো, বসন্তবাবু ওকে ঘাট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বিশেষ প্রয়োজনীয় রোগী হাতে থাকায় হাসপাতালে চলে গেলেন।

তখনও ষ্টীমার ছাড়তে কিছু দেরী—, দ্বিতলে বারান্দায় রেলিঙে ভর দিয়ে অশোক দাঁড়িয়েছিল। সাঁকো দিয়ে কত লোক আস্‌ছে—, প্রত্যেকটি মানুষকে দূর থেকে ওর মনে হচ্ছে যেন সুষমা—গভীর আগ্রহের সঙ্গে সে লোকগুলির নিকটে আশার প্রতীক্ষা করছে। ষ্টীমার ছাড়বার প্রথম ঘণ্টা পড়লো, ও এবার প্রত্যক্ষ দেখলো, সুষমা আস্‌ছে—, হ্যাঁ তাইতো, ঠিক তার মতই তো লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছে—; অশোক দ্রুতপায়ে নীচে নেমে এল। সুষমা তখন সাঁকোর ঠিক মাঝপথ দিয়ে আস্‌ছে, ষ্টীমার ছাড়বার দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়লো। চঞ্চলকণ্ঠে অশোক বললো প্রায় উন্মাদের মতই, "সুষমা শিগ্‌গীর এস, ষ্টীমার ছেড়ে দেবে—" ও তাকে টেনে তুলে নেবে বলে গভীর আগ্রহের সঙ্গে একখানা হাত বাড়িয়ে দিল। কিন্তু সুষমা জেটিতে পৌঁছুতেই, জেটি থেকে ষ্টীমার খোলা হয়ে গেল, মলিন হেসে সুষমা একখানা চিঠি ছুঁড়ে অশোককে দিয়ে দিল। ষ্টীমার জেটি থেকে অনেকটা দূরে সরে গেল নির্বাক ঠোঁটে ওরা দু'জনে দু'জনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে

রইলো, নয়নপ্রান্ত বেয়ে অজস্রধারে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ে ওদের করুণ মুখ দুটিকে সজল করে তুল্‌লো। এই সময় পর্যন্ত যাত্রীদের ঠেলাঠেলি, চীৎকারে চীৎকারে, অসহ্য গরমে আন্মনা অশোক চকিত হয়ে উঠলো, তখন ষ্টীমার মাঝ নদীতে চলছে, সুষমাকে আর দেখা যায় না। অলস অশোক উপরে যেয়ে একখানা ইজি চেয়ারে ভারবাহী দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে, সুষমার চিঠিখানা খুললো। সুষমা লিখেছে—

প্রিয়তমেষু :—

তুমি চলে যাবার সময় তোমার সঙ্গে একবার দেখা করবার খুবই ইচ্ছে ছিল, কারণ জীবনের এ শুভলগ্ন আর বোধহয় কখনওই আসবে না। কিন্তু সংসার আমাকে সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করলো, এর কারণ কী জানো, তোমার সঙ্গে মেশা আমার পক্ষে ভীষণ পাপ ; আমি বিধবা। পাঁচ বছর বয়সে নাকি এক বুড়োর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল, সে আমায় এই নামে পরিচিতা করে দিয়ে বহুদিন আগে ইহজগৎ থেকে বিদায় নিয়েছে। তখন কে জান্‌তো বল, এই পঙ্গু মেয়েটাকে বরণ করে নিতে একদিন এক রাজপুত্র আসবে—, সবাই জান্‌তো এই কথাই, এই খঞ্জ মেয়েটা সবার চোখেরই ঘৃণার আর অবজ্ঞার পাত্রী। তাই তার জীবনটাকে সংযম সাধনার আয়ত্তাধীনে রাখ্‌তে, বৈধব্যের শাসনরজ্জু দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে ; এই ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণই নাকি খঞ্জ মেয়েরই যোগ্যতর পাওনা। তা'হলেই তুমি বোঝ, বিধবা মেয়ের কখনও বিয়ে করা সাজে ? কালকে সন্ধ্যেবেলা নিতান্ত আচম্‌কাভাবে, তোমার স্নেহে

আত্মসমর্পণ করে ফেলেছিলুম বলে, মা আজ আমায় বিশ্বাস করতে পারলেন না, দুয়ারে তালা বন্ধ করে আমায় রেখেছিলেন। ষ্টীমার ছেড়ে যাবার সময় চলে গেল, ঘরও খোলা হোল, ভেবেছিলুম চিঠি-খানা ডাকেই দেব। কিন্তু তোমায় আর একবার দেখবার আগ্রহ সম্বরণ করতে পারছিলাম না। আমার যেতে যেতে ষ্টীমার হয়তো অনেকটা দূরে চলে যাবে—, তা যাক্, তবু তো তোমায় দেখতে পাবো, চিঠিটা যদি না দিতে পারি তোমায়, ডাকেই পাঠিয়ে দেব। আমার অন্তরের আমরণ প্রীতি, শ্রদ্ধা ও প্রণাম নিও! তোমার স্নেহ আমার স্মৃতির মণিকোঠায় চির অম্লান হয়ে থাকবে। যদি পারো ফের্‌বার পথে এস—, আস্‌বে তো?

—তোমার স্নেহের সুষমা

চিঠিখানা কখন যে অশোকের হাত থেকে পড়ে গেছলো তা সে জানে না, ষ্টীমার এসে যে পাণ্ডুর ঘাটে পৌঁছেছিল, তাও তার কাছে অজানা ছিল। সে তখন গভীর চিন্তার-জালে নিমগ্ন ছিল। ওর চোখের দৃষ্টি পলকহারা যেন আগুণের মত ধক্ ধক্ করে জ্বল্‌ছে, বক্র ঠোঁটে প্রতিশোধ উন্মত্ততার একটা হিংস্র ভাব ফুটে উঠেছে, উন্মাদের মত আপন মনে সে চীৎকার করে বলে উঠলো—, "কেন, কেন একটা নিরপরাধী মেয়ে এমনি করে ব্যর্থতার বিষে নিরন্তর জ্বলে পুড়ে মরবে? তার চেয়ে মৃত্যুই কী ওদের পক্ষে যোগ্য পাওনা নয়? মৃত্যু—মৃত্যু—

প্রায় প্রলাপের মতই অশোক আরও যেন কি বলতে চেয়েছিল, ঠিক সেই সময় সোরবজীর ম্যানেজার এসে বললো—, "সব প্যাসেঞ্জার নেমে গেছে, আপনি যে নামছেন না"?

"সত্যি পাণ্ডুর ঘাট এসে গেছে" ? অশোক বিহ্বলের মত উঠে দাঁড়িয়ে বললো, "সাহেব আমাকে এক বোতল ব্র্যাণ্ডি দেবেন তো"।

কয়েকদিন পর খবরের কাগজে শিলং শীর্ষকের সংবাদে দেখা গেল, এলাহাবাদের প্রফেসর মণি বোসের ছেলে অশোক বোস্ নিতান্ত অতর্কিত-ভাবে একটী খঞ্জ মেয়েকে রিভলবার দ্বারা হত্যা করবার দরুণ পুলিশে গ্রেপ্তার করেছে। অশোক বোটানিক্যাল গার্ডেনে একটী বেঞ্চে বসেছিল, সেই সময় একটী খোঁড়া মেয়ে ওর সুমুখ দিয়ে যাচ্ছিল, সে তাকে হত্যা করেছে।

নীলিমা দেবী স্বামীর কাছে এই সংবাদ পেয়ে সুষমার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন, দেখ্লেন—সে একটী চেয়ারে বসে,—হাতে খোলা রয়েছে সেদিনের খবরের কাগজখানা,—মাথাটা হেলান দিয়ে চেয়ারের পিঠে রেখেছে। চোখ দুটী মুদ্রিত। নীলিমা দেবী ডাকলেন, "সুষমা, ও সুষমা, সুষমা—"

কিন্তু সুষমার কোনই সাড়া পাওয়া গেলনা, সে আর সাড়া দেবে কিনা এ কথা কেইবা বল্তে পারে ?

প্রিয়তমে

প্রথম অঙ্ক—প্রথম দৃশ্য

রল্যাণ্ড রোডে পল্লীগ্রামের জমীদার অনুপমের ইংরাজি ফ্যাসানের বাড়ী। দ্বিতলে আধুনিক ষ্টাইলে সজ্জিত ড্রইং রুমে একখানি প্রশস্ত সোফায় বসে গৃহকর্তা তরুণ জমিদার অনুপম একখানি গহনার ক্যাটলগের পাতা ওল্টাচ্ছিল। বয়স তার ত্রিশ, বত্রিশ—স্বাস্থ্য নিটোল, রং গৌর। পরণে ঢিলে পায়জামা, গায়ে সিল্কের স্পোর্ট সার্ট, ড্রেসিং গাউনটা মেঝেয় কাশ্মীরি গালিচার উপরে লুন্ঠিত। "ঢং ঢং ঢং ঢং" ঘড়িতে চারটে বাজলো।

অনুপম—(মেঝের লুন্ঠিত ড্রেসিং গাউনটা ত্রস্তহাতে গায়ে চড়াতে চড়াতে আপন মনে) ওইরে আইলিন বুঝি পড়লো এসে—পই পই করে বলে গেছলো—"অন্য কোনও সময় না প'র অন্ততঃ পরো তিনটার পর যখন ভিজিটাররা আসবে, তখন লক্ষ্মীটি, মাই ডারলিং ওটা একটু গায়ে দিয়ে রেখ" (দেওয়ালে ফিট করা বড় মিররটার সামনে দাঁড়িয়ে নাকটা ঈষৎ কুঞ্চিত করে কোমরের ব্যাণ্ডটা বাঁধতে বাঁধতে) "না বাপু এসব আলখাল্লাগুলো আমার আঁটা পোষায় না—গায়ের মধ্যে যেন পিঁপড়ের দৌরাত্ম সুরু হয়েছে"; (ঘাড়টা কুঁচকে আয়নার আপন প্রতিবিম্ব দেখতে দেখতে হতাশার সুরে) "না পারলেও আবার চলে না—আইলিন এসে চটাচটি সুরু করবে, হয়তো বা বলবে, চললুম তোমায় ডিভোর্স করে আমি চললুম; দরকার কি বাপু ওসব অশান্তিতে—ওর মত একটা গ্রাজুয়েট মেয়ে যদি

আমার মত একটা দ্বিতীয়পক্ষ স্বামীকে বরণ করতে পেরেছে। (একটু থেমে বীরকণ্ঠে) আমিও পারবো নিশ্চয়ই ওকে মনস্তুষ্টি করতে" (টিপয়ের পরে এক সজোর মুষ্টিঘাত পড়লো) সেই সময় দরজার রং-বেরঙের পুঁথীর স্ক্রীণের আড়ালে বাড়ীর ভৃত্য ভজলুর ছায়া পড়লো—হাতে ওর রূপার গড়গড়ায় তামাকু। (জ্বলন্ত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে হুঙ্কার দিয়ে) "বার বার তোকে বলেছি না—বিকেলবেলা আমায় চুরুটের সরঞ্জামগুলো দিয়ে যাবি, কেন কথা শুনিস্‌নে বলতো"? এমন সময় বাইরে মেয়েলী জুতার হীলের টুক্‌টুক্ শব্দ শোনা গেল। মশলাবিহীন পাইপটাই অনুপম মুখে তুলে নিল। ভৃত্যের প্রস্থান—অনুপমের স্ত্রী মিসেস্ আইলিন (অনিলা) মুকরজীএ'র কক্ষে প্রবেশ। পরণে তার পাড়বিহীন ছাপ-তোলা পাতলা সিল্কের শাড়ী, গায়ে ব্লাউস আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না, কাঁধের উপরে, আর পিঠে পেটিকোটের ষ্ট্রাপগুলোই চোখে পড়ে। রুক্ষ ব্যবড্ চুলগুলো রুজমাথা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে।

আইলিন—(ধপ করে স্বামীর পাশে বসে—মিষ্টি দৃষ্টি তার মুখে মেলে) "ও মাই—তুমি এখনও চুরুট ফুঁকছ বসে—মনে নেই পাঁচটায় আমাদের তোমার বন্ধু কুমার শচীনাথের ওখানে Engagement আছে"?

অনুপম—(শুক্‌নো পাইপটায় মৃদু টান দিয়ে স্নিগ্ধ হাস্যে প্রিয়ার আননে চেয়ে) "বুঝলে আইলিন' কুমারের ইনভাইট আমি প্রত্যাখ্যান করলুম, কারণ আজই আমাদের দার্জিলিং রওনা হতে হবে"। (মনে মনে—পূজোর ভীড়ে ওই যে কলেজের বর্বর ছেলেগুলো "Excuse me" বলে রিজার্ভ করা চলন্ত কামরায় লাফ দিয়ে উঠবে সেটা ভীষণ অসহ্য—একটু থেমে প্রিয়ার নরম হাত আপন হাতে তুলে নিয়ে) "তা না'হলে

বুঝলে আনু! লোকের হৈহৈ-তে আমাদের সুন্দর মাধুর্যপূর্ণ নিরালা যারনীটা একেবারে মাঠে মারা যাবে"। (প্রিয়ার নিকটে সরে এসো) "তাই বলেছিলুম তুমি পূজোয় যে শাড়ী গহনা নেবে choose কর, এইবেলা জহরলাল থেকে ঘুরে আসি একবার"।

আইলিন আহ্লাদে গদ গদ হয়ে কৃত্রিম রুক্ষ-গলায় "ও ন্যাষ্টি—তোমার ওই জহরলালের পট্টি—ভীষণ ট্র্যাম আর বাসের ঘড়ঘড়ানি—ওই একটা বিশ্রী ঘেমো গন্ধে মাথা ভীষণ ধরে যায়"।

অনুপম—"তা'হলে তুমি বল কোথা যাবে আইলিন"?

আইলিন—"কেন, বেঙ্গল ষ্টোর্সে—ওরা অভিজাতের সম্ভ্রম রাখতে জানে" (একটু থেমে আফসোসের গলায়) "ডারলিং তোমার কিন্তু কুমারের ইনভাইটটা প্রত্যাখ্যান করা উচিত হয়নি, হাজার হোক ওরা রয়্যাল ফ্যামিলি—লোকের কাছে আত্মীয় বলে গর্ব করার মত"।

অনুপম—(ফোলা গালদুটী নাচিয়ে হাসতে হাসতে) "ওরকম আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব আমাদের পল্লীগ্রামে ছড়াছড়ি, আরও কৃষ্ণনগর থেকে মাসিমা জানিয়েছেন, দার্জিলিং যাওয়ার আগে আমার এই নূতন গ্রাজুয়েট বউটিকে তাকে দেখিয়ে নিয়ে যেতেই হবে"।

আইলিন—(রক্তিম মুখে) "ও গস্" (গড্) সেই কৃষ্ণনগর যেতে হবে—ওটাতো ভীষণ পাড়াগাঁ—আবার ম্যালেরিয়া ধরবে না তো"?

অনুপম—(আশ্বাস দিয়ে) "না আইলিন, ম্যালেরিয়া ধরবে কেন? আমরা সেখানে থাকবো তো ঘণ্টাখানেক, ৬টায় কৃষ্ণনগর গাড়ীতে রওনা হব—আবার রাত্তির দশটায় রাণাঘাট ফিরে মেল ধরবো"।

আইলিন—(আনন্দে লাফিয়ে উঠে) "ও তা'হলে টাইম তো আমাদের

ভীষণ সর্ট, ভেবেছিলুম তোমার কতকগুলো দরকারী জিনিষপত্র এই সময় কিনে নেব, কিন্তু তাতো হবে না, আচ্ছা তুমি (রিষ্টওয়াচের দিকে চেয়ে) ড্রেস করে নাও, আমি Hall and Andersonএ Phone করে বচন সিংকে চেক লিখে পাঠিশে দিচ্ছি। হ্যাঁ শোন, বিয়ের সময় মামা যে স্যুটটা তোমায় বিলেত থেকে পাঠিয়েছিলেন সেইটে পরো, আমি এখুনি গিয়ে টাইটা বো করে দিচ্ছি"। (অনুপমের প্রস্থান)।

আইলিন—(আপন মনে) "একেবারে পাঁড়াগেঁয়ে—টাকা আছে তাকে উইটিলাইজ করতে জানে না। দাদু বলেন—পাঁড়াগেয়ে হলেও খাঁটি, ষ্টাইলের আবরণে মেকি নয়। (ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি ঝলসে উঠলো। বারান্দায় বেরিয়ে এসে রিসিভারটা কানে তুলে নিল) (ইংলিসে) "হ্যালো হল এণ্ড আণ্ডারসন ? হ্যাঁ, বলছিলুম, পাঠাচ্ছি এখনি দারোয়ান, রেণ-কোট শ্লিপওভার ফর্দ্দানুজায়ী জিনিষগুলো ওর হাত দিয়ে দেবেন"।

(রিসিভার রেখে স্বামীর ঘরে গমন)

দ্বিতীয় দৃশ্য

বেঙ্গল ষ্টোরর্সের সুমুখে একখানা মস্ত ক্রাইস্‌লার কার দাঁড়িয়ে। তার তরুণ আরোহী-আরোহিণী সপিং ক'রে আসত দোকানের দরোয়ান সসম্ভ্রমে গাড়ীর দ্বার খুলে দিল, ওরা গাড়ীতে চড়লে দক্ষিণা নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। তখন অনুপম ও আইলিন মার্কেট করে ওদের ট্যাক্সির প্রতীক্ষায় সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে ছিল। মিনিট কয়েক পরে ট্যাক্সি, ষ্ট্যাণ্ড থেকে ওদের সুমুখে এসে দাঁড়াল, দরোয়ান সেদিকে ভ্রূতুলে তাকাল না। আইলিন

মালপত্র নিয়ে গাড়ীতে চড়ে বস্‌ল। অনুপম ফুটপাতে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত চোখে দরোয়ানের দিকে তাকিয়ে।

অনুপম—"এই গাধ্‌ধা হামরা গাড়ীকো দরজা তুম্‌ কাহে নেহি খুলতা হ্যায় বুড়বাক"।

দরোয়ান—(চোখ রাঙ্গিয়ে গোঁফ পাকিয়ে) "বাবুজী মুখ সামালকে বাত বলিয়ে, আপকো নোকার হাম নেই হ্যায়"।

অনুপম—"কেন মুখ সামালসে বাত বোলবো, আলবৎ তুমি আমার নোকার আছ। ওই বাবুর চেয়ে হাম্‌ গরীব কিস্‌মে হ্যায় যে, তুমি হামার গাড়ীকো দরজা নেই খুলেগা, উল্লুক কাঁহাকার" (তার গালে সজোরে এক চপেটাঘাত)।

দরোয়ান—"ও মাই, মাই জান্‌ নিকাল দিয়া— ভাইয়ারে হামারা জান্‌ নিকাল দিয়া" (মেঝেয় উপুড় হয়ে পড়ে উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন, মাথার পাগড়ী রাস্তায় গড়াগড়ি। মুহূর্তে দরোয়ানের ঝাঁক সমবেত হল, ব্যাপারটা কি উপলব্ধি করতে ওদের কিচির-মিচির কণ্ঠস্বর মুখর হয়ে উঠলো। তখন আইলিন নিবিষ্টচিত্তে ওর সদ্যক্রীত ১৯০৲ টাকা দামের সুন্দর ঝল্‌মলে শাড়ীখানা মুগ্ধচোখে নিরীক্ষণ করছিল। ও ভেবেছিল ব্যাপারটা বিশেষ কিছুই নয়। নিতান্ত বচসার রূপান্তর, কিন্তু দরোয়ানের হাউমাউ ক্রন্দনে ওর চমক গেল টুটে, তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে, ভ্যানিটিকেস্‌টা খুলে প্রহৃত দরোয়ানের হাতে দুখানি নোট গুঁজে দিয়ে, মিষ্টিস্বরে)—

আইলিন—"কাঁহা চোট্‌ লাগা হ্যায়? শিরমে? যাও দাওয়াই খানামে যাকে আচ্ছাসে দাওয়াই লাগাও, গুস্‌সা নেহি করো, বাবুসাবকো শিরমে গড়বড় হ্যায়, যাও আভ্‌ভি দাওয়াইখানা চলা যাও (ট্যাক্সিতে উঠে) জলদি

ঘর চলো। (স্বামীর আননে চেয়ে) ছিঃ কি একটা কেলেঙ্কারী করলে বলতো? প্রাইভেট কারকে ওরা সম্ভ্রম করে"।

অনুপম—(মুখটা কাঁচুমাচু করে) "তা আমি কি করে জানবো বল? (আফসোসের গলায়) তা তুমি এতদিন গাড়ী একখানা কেননি কেন? তিনমাস তো বে হয়েছে আমাদের"।

আইলিন—"ভেবেছিলুম মামা ইংলণ্ড থেকে ফিরলে তার সঙ্গে যেয়ে চুজ করে কিনবো। (গাড়ী দরজায় এসে থামলো, এস্তে গাড়ী থেকে নেমে হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) ও গড্, পাঁচটা বেজে গেছে, আয়াকে জিনিষ পত্রগুলো গুছোতে বলি—রামদীন মেলে নিয়ে যাবে—চলো ততক্ষণে আমরা খেয়ে নিইগে"।

তৃতীয় দৃশ্য

শিয়ালদহ ষ্টেশন। মেন ষ্টেশনে ঘণ্টা পড়লো। অনুপম আইলিনকে বহন করে ট্যাক্সি এসে থামলো।

আইলিন—(চকিত হয়ে গাড়ী থেকে নেমে) "তাড়াতাড়ি এস, ঘণ্টা পড়ে গেল, গাড়ী বোধহয় ছেড়ে দিল"। (উভয়ে ঊর্ধশ্বাসে ছুটে যেয়ে সামনের প্লাটফর্মের যাত্রীপূর্ণ গাড়ীখানার একখানা ফাষ্টক্লাস কম্পার্টমেণ্টে চড়ে বসলো)

আইলিন—(কিছুক্ষণ পর দম নিয়ে হাত-ঘড়িটার দিকে চেয়ে) "সাড়ে-ছটা বাজে কই এখনও গাড়ী ছাড়ে না তো—মেল ধরতে পারবো তো"?

অনুপম—(অনুসন্ধানের দৃষ্টি চারিদিকে নিক্ষেপ করে) "তাইতো টাইম

টেবলখানা গেল কোথায়? সেখানা বুঝি ফেলে এলুম। এই কুলী! ইঠো কোন্ গাড়ী হ্যায়"?

কুলী—"বাবুসাব্ ই গোয়ালন্দ ঘাট হ্যায়"।

অনুপম—"এঁ্যা গোয়ালন্দ ঘাট? কৃষ্ণনগর সিটী ছুট্ গিয়া"?

কুলী—"বহুৎক্ষণ বাবুসাব"!

অনুপম—(মুষ্টিবদ্ধে মাথার চুল টানতে টানতে) "সর্ব্বনাশ করেছে আইলিন, সর্ব্বনাশ করেছে, কি ভুলটাই করলুম, আসলে তিন নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে কৃষ্ণনগর সিটি ছাড়ে, তাড়াহুড়োতে প্ল্যাটফর্ম নম্বরটা দেখতেই ভুল হয়ে গেল।

এক সহৃদয় ভদ্রলোক—(আগাগোড়া এই দম্পতীর কথাবার্তা শুনছিলেন) "তা'হলেও আপনি এ গাড়ীতে কৃষ্ণনগর যেয়েও—একঘণ্টার মধ্যে মেল ধরতে পারবেন, এই তো আর পনেরো মিনিট পরেই এই গাড়ীটা ছাড়বে"।

আইলিন—(ভীষণ শশব্যস্ত হয়ে গাড়ী থেকে নেমে) "ও না না, এ গাড়ীতে কিছুতেই যাওয়া হবে না, আমি জানি এর কিছুক্ষণ আগে নর্থ ষ্টেশন থেকে একখানা রাণাঘাট লোক্যাল ছাড়ে (স্বামীর দিকে তাকিয়ে) এস চটপট্ নেমে এস"। পুনর্ব্বায় উভয়ে মেন্ ষ্টেশন হ'তে নর্থ ষ্টেশনে উর্ধশ্বাসে দৌড়, রাস্তায় ভ্যানিটিকেসটা গেল পড়ে আইলিনের হাত থেকে, এক সুশ্রী যুবক সেটা তুলে দিয়ে সাহায্য করলো। অনুপম তার ভারী শরীর নিয়ে ছুটতে পারছিল না, তবু হাঁফাতে হাঁফাতে নর্থ ষ্টেশনে এসে দেখলো প্ল্যাটফর্মের লোহার গেটগুলো বন্ধ)

আইলিন—"এই ও কুলী, হিয়াকো রাণাঘাট লোকাল ছোড় গিয়া—"?

কুলী—"নেহি মেমসাব, এক মাইনা হুয়া উ গাড়ীঠো উঠ্ গিয়া"।

আইলিন—"উঠ্ গিয়া—? (স্বামীর প্রতি চেয়ে) তাহলে চল ওই গোয়ালন্দ ঘাট-খানাই ধরা যাক্"।

অনুপম—(ঘড়ির দিকে তাকিয়ে, হতশার কণ্ঠে) "ওটা বোধহয় এতক্ষণ ছেড়ে দিয়েছে (মনে মনে) আমি আর দৌড়তে পারিনে বাপু, উরু দুটো যেন ভেঙ্গে পড়েছে" (কিন্তু আইলিন তখন ছুটছিল প্রাণপণে, অনুপমকেও তার অনুসরণ করতেই হল)

আইলিন—(প্ল্যাটফর্মের গেটে ঢুকতে ঢুকতে) "ওই যাঃ এ গাড়ীখানাও ছেড়ে দিয়েছে"। (তখন পা—পা করে গোয়ালন্দ ঘাট চলছে, গার্ড সাহেব সবুজ নিশান দেখাতে দেখাতে অতি করুণ নয়নে আইলিনের দিকে তাকালো। আইলিন তখনও আশাকম্পিত বক্ষে ছুটছে যদি গার্ডের ভ্যানখানা কোন রকমে ধরতে পারে)।

অনুপম—(ধপাস করে একটা বেঞ্চে বসে পড়ে—নিরাশ নয়নে চলন্ত গাড়ীর দিকে তাকিয়ে) "কি করছ আইলিন—ও গাড়ী তুমি ধরতে পারবে না, কেন ছুটছো? শেষকালে একটা অ্যাক্সিডেন্ট না করে ছাড়বে না দেখছি—"

আইলিন—(ফিরে সে স্বামীর পাশে বসে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে) "তা'হলে আর কৃষ্ণনগর যাওয়া হলনা, এইতো আর ঘণ্টাখানেক পরেই মেল ছাড়বে, চলো ততক্ষণে বাড়ী থেকে ঘুরে আসা যাক্"।

অনুপম—"না আইলিন, বাড়ী যেয়ে আর কাজ নেই, গাড়ী দিয়েছে, তার চেয়ে চল গাড়ীতে বিছানাপত্তর পেতে ফেলিগে, তা'নাহলে ওই কলেজের ছেলেগুলো রিজাভ গাড়ী দেখেও ভুলের বশে ভীড় করবে এসে"।

আইলিন—(মৃদু হেসে) "তাই চল" (ওরা সাত নম্বর প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করলো)। আইলিন (স্বামীর পাশে চলতে চলতে একটী সাহেবী বেশে সজ্জিত সুন্দর তরুণের পানে তাকিয়ে) "হ্যাল্‌লো মিঃ রয়! কোথায়? টুরে নাকি? কবে লণ্ডন থেকে ফিরলেন"? (স্বামীর পানে চেয়ে) "ইনি আমার কলেজের বান্ধব, সম্প্রতি আই-সি-এস হয়ে লণ্ডন থেকে ফিরেছেন" (মিঃ রয়এর পানে তাকিয়ে) "মিঃ মজুমদার"। (ওদের অভিবাদন বিনিময় হল)

মিঃ রয়—কোথায় আপনারা চল্লেন মিঃ মজুমদার? দার্জিলিং?

অনুপম—(বিরক্তিকে সাধ্যমত আয়ত্তে রেখে) "হ্যা, দার্জিলিং—আপনি"?

মিঃ রয়—"ওই পথেরই যাত্রী"।

আইলিন—(উল্লিসিত কণ্ঠে) "চমৎকার,—ভাবছিলুম দীর্ঘ যারনীটা কি করে কাটবে, চমৎকার সঙ্গী জুটলো—আমাদের কামরায় যেতে আপনার তো কোন আপত্তি নেই মিঃ রয়"?

মিঃ রয়—"কিচ্ছু না, বরং অপর্যাপ্ত আনন্দিত"।

অনুপম বল্‌তে চাইল—কামরা রিজার্ভ যে, কিন্তু ওর ওষ্ঠে বাণী ফুটলো না, বারেক ঠোঁট দুটী হাঁ করে পুনরায় বন্ধ করলো একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

—শেষ—